স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক

এম বাহাউদ্দিন

email: probashi_writer@yahoo.ca

এম. বাহাউদ্দিনের উপন্যাস 'স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক' ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি প্রতি রবিবার। ১০ টি পর্বে প্রকাশিতব্য এই উপন্যাসটির পর্ব-৮ আজ রবিবার, এপ্রিল ২৪, ২০০৫ এ প্রকাশিত হলো। আপনার মতামত লেখককে জানান এই ঠিকানায়ঃ probashi_writer@yahoo.ca –সম্পাদক

৮ম পর্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

-৫৬-

আনিস অনেক দিন থেকে বলে আসছে। বাহার ভাই, চলুন একদিন আলমগীর ভাইএর সাথে বসি। প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের কিছু গল্প শুনি। বসি বসি করেও আর বসা হয়ে উঠেনি। এই সপ্তাহে ঠিকানা পত্রিকায় একটা বড় প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলন নাম দিয়ে। আন্দোলনে প্রবাসীর ভূমিকা নিয়ে অনেক দিন থেকে তর্ক চলছিল। এত বছর পর প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে নতুন নাম সংযোজন নিয়ে।

একজন সাংবাদিক একটা খবরকে নানাভাবে পরিবেশন করতে পারে। এই প্রবাসে যেসব বাংলা পত্রিকা প্রকাশ হয় তাতে খুব কম সংখ্যক পেশাজীবি সাংবাদিক কাজ করেন। সেখানে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সব সময় আশা করা যায় না। তাদের উদ্দেশ্য ব্যবসা। চমকপ্রদ খবর পরিবেশন করে ব্যবসা করা। হোক সেটা বস্তুনিষ্ঠ বা মনগড়া। যদি একান্তই আটকে যায় তখন বলেন 'প্রিন্টিং মিসটেক'। তার উপর আর কথা চলেনা। এ ধরনের প্রতিবেদন অনেক সময় নির্ভর করে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর।

এসব অভিজ্ঞতা থেকে বাহার বলল, এসব প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে ইতিহাস হয়না। চল আনিস, আমরা নিজেরা এর তদন্ত করি। আমরা তৈরি করব প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের ইতিহাস। দু'একজন ছাড়া আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহনকারী সকলেই জীবিত আছেন। আমরা একে একে সকলের সাথে কথা বলব। তাঁদের বক্তব্যের উপর আমরা তৈরি করব ইতিহাস।

বাহার এবং আনিস সরাসরি যোগাযোগ করল কয়েকজন অংশ গ্রহনকারীর সাথে। ঠিকানা পত্রিকার প্রতিবেদন এবং অন্যান্য অংশগ্রহনকারীর সাথে যোগাযোগের পর মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের সারাংশ দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

ড: খন্দকার আলমগীরের বাড়ী বরিশালে। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘুর্নিঝড়ে বরিশাল জেলা একটা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। (পাঠক ক্ষমা করবেন, এখানে নিজের কথা একটু বলার লোভ সামলাতে পারছিনা। লেখক তখন ষ্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের তরফ থেকে রিলিফ নিয়ে বরিশালের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে যে দৃশ্য অবলোকন করেছে তা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভুলবার নয়। দেখেছে একটা ঘুর্ণি ঝড়ের তান্ডব লীলা কি, তার শক্তি কত, তার ক্ষমতা কত, ধ্বংসের পরিধি কত, লাশের পাহাড় কত বড়, লাশের পরিমান কত আর যারা রয়ে গেল তারা কি ভাবে বেঁচে গেল)। সেই ঘুর্ণিঝড়ে বিধ্বস্থ বরিশালে পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে ঠিক সময়ে কিছুই পৌঁছেনি। সেই সময় মাওলানা ভাসানী প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন।

নাড়ীর টান। জন্মস্থানের সাথে অদৃশ্য সুতোয় গ্রন্তিত। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, তাকে টানবেই। হয়ত বা নিজের অজান্তেই টান পড়ে। বরিশালের ঘটনা এবং পাকিস্তান সরকারের ভুমিকা ড: আলমগীরকে টান দিল। এ টানেই তিনি হয়ত তাড়িত হয়ে থাকবেন। তিনি নিউইয়র্কে বসবাসকারি বাঙালীদের নিয়ে একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। ম্যানহাটনের ব্রডওয়ের উপর ১৬৫ ষ্ট্রিটে 'বিট অব বেঙ্গল' রেষ্টুরেন্টে। রেষ্টুরেন্টের মালিক কাজি শামসুদ্দিন সভার তদারকি করলেন। সেই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় 'ইষ্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা'।

তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি থমথমে। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। কখন কি হয় বলা যায় না। ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তান সরকার তাল বাহানা করছে। দেশে কি হচ্ছে তা জানার জন্য প্রবাসীরা অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এরই মধ্যে খবর এল ২৫শে মার্চের ভয়াল রাতের ঘৃণ্যতম আক্রমনের খবর। ইন্ডিয়ান নিউজের মাধ্যমে। সাথে সাথে দেশপ্রেম জ্বলে উঠল প্রবাসীদের মাঝে। নিউইয়র্কের বাঙালিরা একত্রিত হল ম্যানহাটনের ব্রডওয়েতে 'বিট অব বেঙ্গল' রেষ্টুরেন্টে। রেষ্টুরেন্ট মালিক কাজি সামসুদ্দিন সভার পরিচালনা করেন। সেই সভায় ইষ্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা নাম পরিবর্ত করে এর নাম করন করা হয় "বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা"।

বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা একটা পূর্নাঙ্গ কমিটি করে নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচনে সভাপতি পদের জন্য দুজন প্রার্থী। ড: খন্দকার আলমগীর এবং কাজী সামসুদ্দিন। তখন মুষ্টিমেয় বাঙালী ছিল এই শহরে। তাদের বেশিরভাগই রেষ্টুরেন্টে কাজ করে এবং একই অঞ্চলের মানুষ। 'গণতন্ত্র অনেক সময় অযোগ্য ব্যক্তিকে ক্ষমতা দান করে'। পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন, আন্দোলনকারীদের ভাষ্য অনুযায়ী, তখন মনে হচ্ছিল কাজী সামসুদ্দিনের পক্ষেই বেশি ভোট। বেশীরভাগ সদস্য একই এলাকার মানুষ। সেখানেও একটা আলাদা নাড়ীর টান আছে - আমাদের মানুষ। যোগ্যতার মাপকাটি আসে পরে। তাই ড: খন্দকার আলমগীর তাঁর প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন। তিনি চেয়েছিলেন কাজ ভালভাবে চলুক, পদের প্রয়োজন নেই। তাই প্রথম সভাপতি হলেন কাজী সামসুদ্দিন। বিনা প্রতিদ্বন্দিতায়।

সামসুদ্দিন সাহেব ব্যস্ত ব্যবসা নিয়ে। বাংলাদেশে ২৫শে মার্চের ভয়াল রাতের খবর যখন তাদের কাছে পৌঁছল তখন তারা প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। আমেরিকাতে জনমত সৃষ্টি করতে হবে, আমেরিকা পাকিস্তানকে অস্ত্র গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করছে, তা রুখতে হবে। প্রতিবাদ করতে হবে। আমেরিকার যেখানে যত বাঙালী আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, এক জোট হতে হবে। তাই সৃষ্টি হল "একশন কোয়ালিশন ফর বাংলাদেশ"। সকল সদস্য অনুধাবন করলেন, এসব কাজের জন্য ড: খন্দকার আলমগীর যোগ্য ব্যক্তি। তাই সকলে এক বাক্যে ড: আলমগীরকে সেই কমিটির সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত করেন। একশন কোয়ালিশন ফর বাংলাদেশ'র কাজ হল: (১) আমেরিকায় বসবাসরত সকল বাঙালীকে যোগাযোগ করা (২) জাতিসংঘের সদস্য দেশের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থার বর্ণনা দেয়া (৩) আমেরিকার জনমত সৃষ্টি করা যাতে নিরীহ মানুষ খুন করার জন্য আমেরিকা পাকিস্তানকে সাহায্য না করে (৪) নিউজ মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ রাখা এবং (৫) জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা।

খবর পৌঁছে যায়। দেশদরদী আর দেশপ্রেমিকরা খবর জানার জন্য উদ্‌গ্রীব। একশন কমিটি যোগাযোগ করার আগেই অনেকে খবর জেনে গেছে।

ড: আলমগীরের নেতৃত্বে শুরু হল একশন। অন্যান্য রাজ্যে যত বাঙালী ছিল সকলের সাথে যোগাযোগ হল।

বোষ্টনে নেতৃত্ব দিলেন ড: মাহবুব আলম, ড: আবদুল মোমেন এবং ড: বিনয় পাল। শিকাগোতে নেতৃত্ব দিলেন বিখ্যাত স্থপতি ফজলুর রহমান, শামসুল বারী, পবিত্র সরকার, আইনুল হক, এডওয়ার্ড মিক, র‍্যালফ নিকোলাস, ক্লিনটন সীলি। সেখানে বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের প্রথম পরিচালক হিসেবে কাজ করেন আজকের গ্রামীন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ড: ইউনুস। ফিলাডেলফিয়াতে নেতৃত্ব দিলেন ড: মাজহারুল হক। এমনি করে কিছুদিনের মধ্যেই অন্যান্য রাজ্য থেকে ১৬টি সংগঠন একত্রিত হল। বিরাট বিক্ষোভ হল জাতিসঙ্ঘের সামনে। তাতে শুধু বাঙালী নয়, অনেক আমেরিকানও যোগ দিল। এদিকে আমেরিকান জনমত তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে। আমেরিকানরা একটা সংগঠন করেছে। নাম দিয়েছে "ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ"। এই সংগঠন এবং আরও অনেক আমেরিকান সংগঠন এই রেলিতে যোগ দেয়। সংগঠন ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে অনেক আমেরিকান রেলিতে অংশগ্রহন করে স্বত:স্ফুর্তভাবে।

সিনেটর হামফ্রে বাংলাদেশে গণহত্যার কাজে পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রয়ের বিরুদ্ধে সিনেটে বিল আনেন। আমেরিকান সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্বেও অস্ত্রের জাহাজ যাচ্ছে পাকিস্তানে। খবর দিয়েছে উইলিয়াম গ্রীনো। এস, এস পদ্মা নামে জাহাজ ভিড়বে বাল্টিমোর ডকে। গ্রীনো ফিলাডেলফিয়ার কোয়েকার গ্রুপের সদস্য। কোয়েকার গ্রুপ একটি শান্তিবাদি দল। বাংলাদেশে গণহত্যার খবর শুনে তারা প্রতিবাদে নেমেছে বাঙালীর পাশে। জাহাজ যাতে ডকে ভীড়তে না পারে তারা তার প্রতিবাদ করবে। বাধা দিবে। একটি ছোট্ট ডিঙ্গি নিয়ে পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে পানিতে নেমে সেই জাহাজকে বাধা দিল। পুলিশের গ্রেফতার এড়ানোর জন্য কোন বাঙালিকে পানিতে নামতে দেয়া হয়নি। কোয়েকারের নেতা চার্লস কান-এর নির্দেশে। জাহাজ অবশ্য ডকে ভিড়েছিল কিন্তু ডক কর্মচারিদের অসহযোগিতায় ফিরে যেতে বাধ্য

হয়। কোয়েকারের কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছিল। তাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন: বিল ম্যায়র, ডিক টেলর, এ্যান টেলর, উইলিয়াম গ্রীনো, ডেভিড নলিন, র‍্যালফ নিকোলাস, মারটা নিকোলাস, এডওয়ার্ড ডিমক ও ক্লিট সীলি। প্যানসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক চার্লস কান এই কোয়েকার গ্রুপের অন্যতম নেতা। তিনি বাংলাদেশ সংসদ ভবনের স্থপতি লউ কানের ভ্রাতুস্পুত্র। ড: মোনায়েমের সাথে কানের পরিচয় ছিল। তারই সাহায্যে কোয়েকার গ্রুপ এই বিক্ষোভে নেমে পড়ে। ড: মোনায়েমের সাথে বাঙালী আরও যারা সহযোগিতায় ছিলেন তারা হলেন: জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, পুরবী দত্ত এবং নিউইয়র্ক থেকে আগত আরও অনেকে।

একশন ফোর্সের কাজ আরও এগিয়ে যাচ্ছে। ষ্টপ জেনোসাইড ইন বাংলাদেশ। ষ্টপ হেলপিং পাকিস্তান। এই শিরোনামে পঞ্চাশ হাজার আমেরিকানদের স্বাক্ষর গ্রহন করে আমেরিকান কংগ্রেসম্যানদের হাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। প্রতিবাদের চিঠি লেখা হয়েছে প্রতিটি সিনেটরের কাছে। এ ব্যাপারে সিনেটর কেনেডির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে লবি করেছেন। তার সাহায্যে একশন ফোর্স সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রতিটি মেম্বার সদস্যদের হাতে স্বারকলিপি পৌঁছে দিয়েছে। পার্লামেন্টে সিনেটর কেনেডি বাংলাদেশের পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন।

জনমত সৃষ্টি হচ্ছে। আমেরিকানরা কমিটি করেছে। 'সেভ বাংলাদেশ' নামে তারা চাঁদা আহরন করছে। একশন ফোর্সও চাঁদা আহরনে নেমে গেছে। ড: আলমগীর সমস্ত নিউজ মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ করছেন। বাংলাদেশে কি ঘটছে তা মিডিয়ার হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন। তখন খবর আদান প্রদানের এক মাত্র ব্যবস্থা ছিল লন্ডন হয়ে। অথবা বিবিসির মাধ্যমে। আমেরিকায় বসবাসরত সমস্ত বাঙালীর কাছে খবর পৌঁছত মুখে মুখে অথবা ফোনে।

প্রায় প্রতিদিন বিক্ষোভ হচ্ছে জাতিসঙ্ঘের সামনে। উইকএন্ডে সকলে চলে যায় ওয়াশিংটনে। হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সকালে যায় আর রাতে ফিরে আসে। যখন তখন সভা হচ্ছে। সভার স্থান বিট অব বেঙ্গল। সকলেই ব্যস্ত যার যার ভাগ করা কাজ নিয়ে।

এসময় পাকিস্তানের কনসুলেট জেনারেল ছিল নুরুল ইসলাম। তিনি বাঙালী। পাকিস্তান তাকে ডেকে পাঠাল দেশে ফিরে যাবার জন্য। তিনি তার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পাবার আশায় ফেরত গেলেন। তার অধ:স্তন থার্ড সেক্রেটারি জনাব মাহমুদ আলী ডিফেক্ট করলেন। যোগ দিলেন আন্দোলনে। একশন ফোর্স আরও চাঙ্গা হয়ে উঠল। এখন থেকে তাঁর বাসায় প্রায়ই সভা হয়। পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি বাংলাদেশের কাজে সম্পুর্নভাবে নিয়োজিত করলেন। জাতিসঙ্ঘের অনেক সদস্য দেশের সাথে তাঁর পরিচয় থাকায় তিনি রাজনৈতিকভাবে প্রায় সমস্ত দেশের সাথে যোগাযোগ করলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে সিকিউরিটি কাউন্সেলের সদস্য দেশের একটা ধারণা জন্মে গেল বাংলাদেশে কি ঘটছে।

এসময় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এম আর সিদ্দিকী আসেন নিউইয়র্কে। তিনিও যোগ দেন আন্দোলনে। আবু সাঈদ চৌধুরী ইউরোপ থেকে চলে এলেন নিউইয়র্কে। তিনিও যোগ দেন আন্দোলনে। বিক্ষোভ চলছে। জাতিসঙ্ঘের সামনে, হোয়াইট হাউসের সামনে। যে যেভাবে পারে চাঁদা আদায় করছে। সাহায্য করতে হবে, মুক্তিযোদ্ধাদের আর

শরণার্থীদের। একশন ফোর্স পনের হাজার ডলার তুলে দিল আবু সাঈদ চৌধুরীর হাতে।

কিছু লোক মুক্তিযুদ্ধের নামে চাঁদা আদায় করে নিজেদের পকেট ভারি করেছে। নির্বানা রেষ্টুরেন্টে একটা সাহায্যের বাক্স ছিল। তাতে কত টাকা পড়েছে তার হিসাব কেউ কোনদিন কোন কমিটির কাছে পেশ করেনি। ওয়াদুদ নামে একজন একটা ড্রাম সার্কেল তৈরি করে টাকা আদায় করে কোথায়ও জমা দিয়েছে বলে প্রমান মেলেনি।

রশিদুজ্জমান তখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সভা করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন ড: গর্ডনের সভাপতিত্বে। তখন পাকিস্তানের পক্ষে গান গাইতে আসেন সাজ্জাদ হোসেন, মোহর আলী, দীন মুহাম্মদ ও নুরুল ইসলাম। তাদের কাজকর্মে আইনত: সোজাসোজি বাধা দেয়া যায় না বলে তাদের সাথে একশন কমিটির সদস্যরা আলাদা আলাদ গ্রুপ করে তাদেরকে মিটিংএ যাওয়ার সময় নষ্ট করে দেন। তাদের মধ্যে সাজ্জাদ হোসেন যে হোটেলে থাকতেন সে হোটেলে একশন কমিটির কয়েকজন তার সাথে দেখা করতে গেলে তিনি তাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেন এবং পুলিশ ডাকেন। পুলিশ এসে হাফিজ রিয়াজুদ্দিনকে গ্রেফতার করে। কয়েক ঘন্টা পরেই রিয়াজুদ্দিনকে ছাড়িয়ে আনা হয়। মোহর আলী পরবর্তিতে সৌদি আরবে মারা যান। দীন মুহাম্মদ বর্তমানে বাংলাদেশে একজন লেখক। আর নুরুল ইসলাম পরবর্তিতে জাষ্টিস হয়েছেন।

পাকিস্তানের প্রতিনিধি শাহ আজিজুর রহমান তখন জাতিসঙ্ঘে পাকিস্তানের দালালী করছে। তার বিরুদ্ধে বড় আকারে ডেমোনেষ্ট্রেশন দেয়া হল। তার কিছুদিন পর এল চট্টগ্রামের ত্রিদিব রায়। পাকিস্তানের গান গাইতে। তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানানো হল। পরবর্তীতে পাকিস্তান অবজারভারের সম্পাদক হামিদুল হক চৌধুরী আসেন পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার দালালী করতে। জ্যোতি প্রকাশ দত্ত (বর্তমানে ডক্টর এবং বাংলা একাডেমী পুরষ্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক) ছিলেন ফিলাডেলফিয়াতে। তিনি এসেছিলেন পাকিস্তান অবজারভারের পক্ষ থেকে বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার্থে। হামিদুল হক চৌধুরীর সাথে দত্ত বাবুর ভাল সম্পর্কের কারণে ড: আলমগীর এবং নিউইয়র্কের কিছু বাঙালী দত্ত বাবুকে নিয়ে হামিদুল হক চৌধুরীর সাথে দেখা করেন। তারা জনাব চৌধুরীকে বুঝাতে চেষ্টা করেন তিনি যেন পাকিস্তানের পক্ষে কথা না বলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে যোগদান করেন। জ্যোতি প্রকাশ দত্তও চেষ্টা করেন তাকে বুঝাতে। কিন্তু তার একই কথা, দেশটা ইন্ডিয়া নিয়ে যাবে।

ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালী কর্মচারিদের সাথে যোগাযোগ করা হয় তারা যেন আন্দোলনে যোগ দেন। তাদের মধ্যে শামসুল হক ছিলেন ফরেন মিনিষ্টার। তিনি বাঙালীদের সাথে কথা বলতেই রাজি হননি। আর একজন ছিলেন আব্দুল্লাহ আল মতি। তারা কেউ আন্দোলনে সহযোগিতা করেনি। পরবর্তিতে বাঙালী কর্মচারিরা ইন্ডিয়ান দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করে দর কষাকষি করে। তাদের দাবি তারা যদি পাকিস্তান সরকার থেকে পদত্যাগ করে তাহলে তাদের নগদ অর্থ এবং চাকুরির নিরাপত্তা দিতে হবে। সেই মতে দশ হাজার ডলার নগদ হাতে নিয়ে তারা পদত্যাগ করে। তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন আজকে তাদের নাম করলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

খবর আদান প্রদানের কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ সকলেই অধির আগ্রহে অপেক্ষা করে কি ঘটছে বাংলাদেশে তা জানার জন্য। ইন্ডিয়ান

নিউজ বা বিবিসির মাধ্যমে যা আসে তাই। তখন একশন ফোর্সের তরফ থেকে একটি খবরের কাগজ বের করার সিদ্ধান্ত হয়। "শিখা" নামে এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন বামনদাস বসু। শুধু মুক্তিযুদ্ধের খবর প্রকাশের জন্যই এই পত্রিকা শুরু হয়। স্বাধীনতার পরও কিছুদিন চলছিল। তারপর আর চলেনি।

এর কিছুদিন পর প্রতিবাদীরা পাকিস্তান হাউস দখল করে নিল। তারা দাবী করল বাংলাদেশের অংশ। বাংলাদেশের হিস্যা না পাওয়া পর্যন্ত তারা তাদের দখল ছাড়বে না। এক সময় পুলিশ আসতে বাধ্য হল। প্রতিবাদীদের সাথে বৈঠক হল। তারা বুঝাতে সক্ষম হল যে, এর হিস্যা এভাবে দখল করে আদায় হয়না, এ ধরনের কাজ করা বেআইনী। রাজনৈতিকভাবে আদায় করতে হবে। প্রতিবাদীরা জানে এভাবে আদায় হয়না। তারপরও জেনেশুনে তারা দখল করেছে শুধু প্রমান করার জন্য যে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের অংশ নয়।

ড: আলমগীর কলকাতায় গেলেন সরেজমিনে পরিদর্শনে। সাথে নিয়ে গেলেন অনেক ঔষধ পত্র, ওয়াকি টকি, বাইনোকোলার এবং চারটা কমিউনিকেশন সেন্টার। এই চারটা কমিউনিকেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছিল - একটা কল্যানিতে, একটা আগরতলায়, একটা রায়পুরায় এবং একটা সুন্দরবনে। তারপর পাঠানো হয় একটা ট্রান্সমিটার। তিনি ফিরে এসে শরণার্থী শিবিরের করুন কাহিনী বিবৃত করলেন। মুক্তিযুদ্ধের একটা বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন এক সভায়। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে সামান্য অস্ত্র নিয়ে পৃথিবীর শক্তিশালি একটা সামরিক বাহিনীর সাথে লড়ছে তার একটা চিত্র তুলে ধরলেন। নতুন উদ্দমে একশন ফোর্স কাজে লেগে গেল। চাঁদা তুলতে হবে, শরণার্থীকে, মুক্তিযোদ্ধাকে সাহায্য করতে হবে। অস্ত্র চাই, গোলা বারুদ চাই। তার জন্য চাই ডলার।

আব্দুস সামাদ আজাদ এবং ফণি ভূসন মজুমদারের নেতৃত্বে পনের জনের একটি দল আসে এই আন্দোলনকে শক্তিশালি করার জন্য। এসময় ইন্দিরা গান্ধির দূত কৃষ্ণ মেনন আসে নিউইয়র্কে পরিদর্শনে। তিনি এসে দেখেন এই নেতাদের মাঝে দলাদলি। তাই তিনি বললেন, এখানকার স্থানীয় প্রবাসী দ্বারা এই আন্দোলন করা উচিত।

এ সময় পন্ডিত রবীশঙ্কর আমেরিকায় এলেন কোন একটা অনুষ্ঠানে। তাঁর কাছে পৌঁছা চাট্টিখানি কথা নয়। কারও সাথে পরিচয় নেই। ড: আলমগীর ধর্না দিলেন অশোক দত্তের কাছে। অশোক দত্ত ড: আলমগীরের বন্ধু। অশোক দত্ত জানেন রবীশঙ্করের তানপুরা বাজায় কমলা মুখার্জি। পরামর্শ করে ঠিক হল অশোক দত্ত এবং ড: আলমগীর যাবেন কমলার কাছে। সাথে ইন্ডিয়া এব্রডের সম্পাদক জ্যোতি দত্ত। কমলা পথ করে দিলেন। তারা ওস্তাদের কাছে আর্জি পেশ করলেন। বাংলাদেশের এই মহা বিপদে আপনি কি সাহায্য করতে পারেন? তিনি নিজেও ভাবছিলেন বাংলাদেশের কথা। স্থির করলেন জর্জ হ্যারিসনকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করবেন। জর্জ হ্যারিসনকে রাজি করানো সোজা কথা নয়। তিনি দায়ীত্ব নিলেন। সব শুনে জর্জ রাজী হলেন। নিউইয়র্কের মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" অনুষ্ঠিত হল। ৬০ হাজার লোক ধারন করে এই হলে। ড: আলমগীর এই ৬০ হাজার লোকের স্বাক্ষর গ্রহন করলেন। এই স্বাক্ষর তিনি পৌঁছে দিলেন নিক্সনের দরজায়, সিকিউরিটি কাউন্সেলের প্রতিটি সদস্য দেশের প্রতিনিধির হাতে। এই কন্সার্টের পর বাংলাদেশ বিশদ পরিচিতি পায়। আন্দোলনের সুবিধা হয়। এই কন্সার্টের প্রবেশ মূল্য থেকেই ৭ মিলিয়ন ডলারের উপর জমা হল। সেই টাকা তুলে দেয়া হল রেডক্রসের হাতে।

ইন্ডিয়াতে বাংলাদেশী শরণার্থিকে সাহায্য করার জন্য। তারপর রেকর্ড বিক্রি করে, টিভি শো থেকে কত ডলার আয় হয়েছে তার সঠিক তথ্য কোন সোর্স থেকেই পাওয়া যায়নি।

যারা নিজেদের রুটি রোজগারের কর্ম বিরতি দিয়ে এই আন্দোলনে নিরলস কাজ করে গেছেন তাঁদের সকলের নাম যোগার করা সম্ভব হয়নি। যাঁরা প্রধান ভুমিকায় ছিলেন তাঁরা হলেন: ড: খন্দকার আলমগীর, কাজী সামসুদ্দিন আহাম্মদ, মাহফুজ চৌধুরী, ফয়েজুর রহমান, বামনদাস বসু, আব্দুল হক, ড: শাহদাত হোসেন, স্থপতি ফজলুর রহমান, শামসুল বারী, ড: মাহবুবুল আলম, ড: বিনয় পাল, ড: ফরিদা মজিদ, আব্দুল খালেক, লাকী, গুলশান আরা পুস্প, ফরিদ আহম্মদ, নুরুল আমিন চৌধুরী, ওয়াহিদ, শাহাদত হোসেন, কাজী জাকারিয়া, তালুকদার, রফিকুল ইসলাম, মাহবুব হোসেন, জামসেদ খান, মুহাম্মদ সালেহ, হাফিজ রিয়াজুদ্দিন, মহসিন সিদ্দিকি, রিয়াজ আহম্মদ, ড: শুধাংশু কর্মকার, ড: মহিউদ্দিন আহাম্মদ, ড: ফয়জুর রহমান চৌধুরী, ড: রোকেয়া খাতুন, মিসেস মাহমুদ আলী, প্রফেসর আব্দুল লতিফ, আব্দুল আওয়াল মিন্টু, লতিফ চৌধুরী, রোজ মুখার্জি, ড: সুলতানা, এনায়েতুর রহিম, সুলতান আহাম্মদ, নুরুল ইসলাম ভূইয়া, রওশন আরা চৌধুরী, আইনুল হক, মমতাজউদ্দিন, ড: জ্ঞান ভট্টাচার্য এবং প্রফুল্ল মুখার্জি। এর বাইরেও অনেকে আছেন যাঁদের নাম যোগার করা সম্ভব হয়নি বলে খুবই দু:খিত।

এই আন্দোলনের শুরু থেকে ইকবাল আহাম্মদ নামে এক পাকিস্তানি খুবই সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তিতে তার সাথে কারো যোগাযোগ ছিল বলে জানা জায়নি। অবাঙালী যারা সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন রেভারেন্ড ডনাল্ড হ্যারিংটন, প্রফেসর হ্যারিংটন, ড: গর্ডন এবং আরও অনেকে। তাছাড়া ইন্ডিয়ার বহুলোক, সাউথ ইন্ডিয়ান এবং আমেরিকার কোয়েকার গ্রুপ।

যাঁরা বিক্ষোভে অংশ গ্রহন করেছিলেন তাঁদের সকলের নাম প্রকাশ করা গেলনা। এই আন্দোলনে প্রবাসীর ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয় এবং বাংলাদেশ তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সকলে হয়ত সমান দায়ীত্ব পালন করতে পারেননি বা সুযোগ পাননি। ড: আলমগীরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু দু'একজন বাঙালীর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাদের একজন হলেন কাজী সামসুদ্দিন, যিনি তাঁর হোটেলকে আন্দোলনের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে নিজের ব্যবসার ক্ষতি স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। প্রয়োজনে যথেষ্ট টাকা পয়সা খরচ করেছেন। আর একজন প্রফুল্ল চন্দ্রমুখার্জি।

প্রফুল্ল চন্দ্র মুখার্জি সম্মন্ধে কিছু না বললেই নয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের এই নয় মাস নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জাতি সঙ্ঘের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। বুকে একটা সাইন, "সেভ বাংলাদেশ"। রোদ বৃষ্টি ঝড় তাঁকে বিরত করতে পারেনি। তিনি এক মুহূর্তের জন্য জাতি সঙ্ঘের ফটক থেকে সরে দাঁড়াননি। তাঁর স্ত্রী তাঁর খাবার নিয়ে যেতেন। কখনও তার পরিচিত অন্য কেউ। তিনি দাড়িয়েই খাবার সেরে নিতেন। কোন কোন দিন তিনি না খেয়েই সারাদিন কাটিয়ে দিয়েছেন। ডেমোনেস্ট্রেশন শেষে তিনি চাঁদা তুলতে বেরিয়ে পড়তেন।

পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি বিক্ষোভ করেছেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

স্বাধীনতার পর ড: আলমগীর ৭২ জনের একটা আমেরিকান রিলিফ টিম নিয়ে দেশে যান রিলিফ বিতরন করার জন্য। এই টিম চেয়েছিল সরাসরি বিতরন করার জন্য। কিন্তু কিছু সরকারী আধা সরকারি সংস্থার হস্তক্ষেপে তারা বিতরণ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ড: আলমগীর বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাত করে অনুমতি চেয়েছিলেন। মিলেনি। টিম তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বিতরণ না করেই ফিরে আসে।

বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু রাজাকারের বিরুদ্ধে চলছে। কতদিন চলবে কে জানে! অনেক মুক্তিযোদ্ধা খেতাব নিয়ে সন্তুষ্ট আছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের ইতিহাসও নেই, তাদের কর্মের কোন স্বীকৃতিও নেই। অথচ তাঁদের অবদান অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কোন কোন দেশদরদি উপাধি পাবার যোগ্যতা রাখে।

আমরা তাঁদেরকে সব উপাধীর উপর উপাধী দেব 'নিঃস্বার্থ দেশদরদী'!

-৫৭-

আমান কেইস পেয়ে গেছে। দু বছর হল। বাদলের প্রশিক্ষণ কাজে লেগেছে। প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক হয়েছে। কয়েকবার প্রশ্নের পরও কোন নড়চড় হয়নি। চোখ খোলা রেখে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিয়েছে। শিক্ষকতার পরীক্ষা পাশ করেছে। ফুল টাইম টিচার হিসেবে একটা প্রাইমারি স্কুলে যোগ দিয়েছে। স্ত্রীপুত্রের ভিসা হয়ে গেছে।

আলাদা বাসা ঠিক করেছে। আনিসকে বলেছিল তার সাথে থাকতে। আনিস বলেছে সে এখানেই ভাল থাকবে। বন্ধুত্ব বজায় থাকবে। আমান বাসা নিয়েছে এষ্টোরিয়াতে।

মেসের জগলুর রুমমেট রফিকের কাগজ হয়েছে। তার স্বপ্ন ছিল একটা রেষ্টুরেন্ট করার। ম্যানহাটানের সিক্সথ ষ্ট্রিটে রেষ্টুরেন্ট চালু করেছে প্রায় ছয় মাস। ভাল চলছে। তার মা'বোনকে স্পন্সর করেছে। তারাও এক মাস পর এসে পৌঁছবে। প্রায় একই সময়ে মেস থেকে দু'জন চলে যাচ্ছে।

রফিক আর আমান আনন্দে ভাসছে। তাদের স্বপ্ন সফল হচ্ছে। এই আনন্দটা একা ভোগ করে ঠিক উপভোগ করা যাচ্ছে না। তাই তারা দু'জনে মিলে বাসায় একটা ছোটখাটো পার্টি দিল। খুব কাছের বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে। আনন্দ ফুর্তি করার জন্য।

এই আনন্দের মাঝে আনিস একটা বাংলা পত্রিকার খবরের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বেশ কিছু মজা করল সবাই। খবরটা হল ধাক্কা ব্যবসা। এই ব্যবসা বাংলাদেশের রিক্সা ধাক্কা ব্যবসা নয়। কোন ব্রিজে উঠার সময় কাদাপানিতে পিচ্ছিল পথ, রিক্সাওয়ালা উঠাতে পারছেনা। যাত্রী নামছেনা তার পোষাক ময়লা হয়ে যাবে এই জন্য। তখন কিছু টোকাই এসে রিক্সা পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে দিয়ে দু পয়সা কামায়। এটা সেই ধাক্কা ব্যবসা নয়। সম্পুর্ণ নতুন ধরণের ব্যবসা।

ব্যবসাটার নাম ধাক্কা ব্যবসা। পাঠক! আমি ঠাট্টা নয়। সত্যিই এই ব্যবসার নাম ধাক্কা ব্যবসা। নাম দিয়েছে ঠিকানা পত্রিকা। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন আমাদের বঙ্গ সন্তান জনাব কোরবান শাহী। নিয়ম অনুযায়ী তিনি নোঙ্গর করেছিলেন নিউইয়র্কে আজ থেকে তিন বছর আগে। এখানে

কাজের সুবিধা করতে না পেরে অথবা অন্য কোন কারনেই হোক তিনি পাঁড়ি দিলেন লসএঞ্জেলেস-এ। সেখানে তিনি একটা গ্রোসারী ষ্টোরে কাজ করেন এবং একটা পুরনো গাড়ী খুব সস্তায় খরিদ করে চালাতে থাকেন। একদিন তার গাড়ীকে এক কৃষ্ণাঙ্গ চালক ধাক্কা দিয়ে গাড়ীর ক্ষতি করে। তাতে সেই কৃষ্ণাঙ্গের গাড়ীর ইনসিউরেন্স কোম্পানী কোরবানকে বেশ কিছু ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। যা প্রদান করা হয় তা গাড়ীর দামের দ্বিগুন। সেই থেকেই কোরবানকে লোভে পেয়ে বসল। মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। সে তার বন্ধু সমিরকে বলল, তোর গাড়ীটা তো অনেক পুরাতন। তোকে একটা নতুন গাড়ী কিনে দিব যদি আমার কথামত কাজ করিস।

কি বলছিস তুই! তুই আমাকে নতুন গাড়ী দিবি?

নতুন না হলেও কাছাকাছি দিতে পারব। তবে কিছু কথা আছে। তা হল আমারও কিছু লাভ থাকতে হবে। যদি রাজি থাকিস তাহলে বুদ্ধিটা দিই।

সেটা কিভাবে?

তোকে টাকা পাবার ব্যবস্থা করে দিব। শর্ত হল, যা পাবি তার অর্ধেক আমার। রাজি?

হা, রাজি। এখন বল্, কি করতে হবে।

তোর কিছুই করতে হবেনা। শুধু তোর গাড়ীটাকে আমার গাড়ী দিয়ে ধাক্কা দিয়ে একবারে ডেমেজ করে দিব। তুই শুধু ইন্সিউরেন্স ক্লেইম করবি। তারপর উকিলের পরামর্শ অনুযায়ী আরও কিছু কাজ করবি। সেখান থেকে যা পাবি তারও অর্ধেক অর্ধেক।

সেটা আবার কি?

উকিল বলে দিবে কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে। তোর কিছু করতে হবেনা। তুই শুধু সময় মত যাবি আর আরাম করে শুয়ে থাকবি।

সে আবার কি!

সব জানবি। এখন বল, আজই ধাক্কা দিব কিনা।

আরে এই গাড়ী তো যখন তখন রাস্তায় বন্ধ হয়ে যায়। আমি ফেলে দিব বলে ভাবছি। এটাকে ভাংলেই কি আর না ভাংলেই কি। মার ধাক্কা!

দুজনে বেরিয়ে গেল। সমির তার গাড়ীটা একটা চৌরাস্তার মোড়ে থামাল আর কোরবান এসে তার গাড়ী দিয়ে সমীরের গাড়ীর পেটে এমন জোরে মারল গাড়ীর পেছনের দরজা একবারে দু'ফুট ভেতরে ঢুকে গেল। কোথায় মারতে হবে তা কোরবান জানে। যাতে সমিরের গায়ে আঘাত না লাগে তা খেয়াল রেখেই মেরেছে। সমীর যাতে কোন রকম আঘাত না পায় তার ব্যবস্থা আগেই করেছে। তার বুকে একটা বালিশ আর পিঠে একটা বালিশ দিয়েছে। একবারে নিশ্চিন্ত, ব্যথা পাবেনা। কাজ হয়ে গেলে বালিশ দুটো সরিয়ে পুলিশ ডাকল। পুলিশ এসে রিপোর্ট লিখল। কোরবানের ফল্ট মানে কোরবান দোষি। কোরবানের ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করা হল। তারপর সমীরকে পাঠিয়ে দেয়া হল উকিলের কাছে। উকালতি খেলা খেলার জন্য। যা তাদের পেশা।

পৃথিবীতে সব পেশায় কিছু অসৎ লোক থাকে। এদেশে সব বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা পেশাজীবি থাকে। এক্সিডেন্ট ক্লেইম-এর জন্য আলাদা এক জাতের উকিল আছে। তাদের কাজই হল ছয়কে নয় করা, রাতকে দিন করা। তারা অপরাধচক্রের সাথে জড়িত। কিভাবে ইন্সিউরেন্স থেকে টাকা আদায় করতে হয় তা তারা ভাল জানে। এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে গেলে কি কি ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায় তা তাদের

নখদর্পণে। এদেশে ডাক্তার জাতীয় এক শ্রেনীর অপরাধি আছে তাদের বলা হয় কাইরোপ্রেক্টর। বলা যায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত অপরাধী। সরকারের স্বীকৃত। তারা আহত রুগীর সেবা করার নামে ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর টাকা আত্নসাৎ করে। এইসব ডাক্তার এবং উকিলদের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকে। একে অপরের কাছ থেকে কমিশন পায়। যেমন আমাদের দেশের ডাক্তার মলমূত্র পরীক্ষার নামে কমিশন পায়।
উকিল সমিরের নাম ধাম নিয়ে একটা ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিল একজন কায়রোপ্রেক্টরের কাছে। সেখানে যাবার সাথে সাথেই সমিরকে রাজকীয় আপ্যায়নে নিয়ে একটা বিছানায় শুইয়ে দেয়া হল। নার্সদের সুপারভাইজর এসে তার সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করল। অবশ্য উকিল বলে দিয়েছিল এখানে কি কি প্রশ্ন করবে আর কি কি উত্তর দিতে হবে। তার শরীরের কোন্ কোন্ জায়গায় জখম হয়েছে, কোথায় মচকে গেছে, কোন অংশে ব্যথায় অস্থির এসব রেকর্ড করা হল। রেকর্ড শেষে দেখা গেল সমীরের শরীর সম্মন্ধে সমীরের চেয়ে নার্স বেশি জানে। প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা আর এক্সরে শেষে ঘন্টাখানেক মালিশ করা হল তার সমস্ত শরীর। হাতে নয়, মেশিন দিয়ে। পরদিন ঠিক একটায় চলে আসার জন্য বলে দিল।

এই মালিশটা খুব আরামের। কয়েক মিনিটেই ঘুম এসে যায়। আহ্, কি আরাম! এক মাস প্রতিদিন চলল এই মালিশ। তারপর সপ্তাহে চার দিন, তারপর তিনদিন, তারপর দুদিন, তারপর একদিন। এমনি চলল মাস ছয়েক।

এই চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে সমির একটা চেক পেয়ে গেছে। গাড়ীর ভর্তুকী। একজন এডজাষ্টার এসে গাড়ীর মূল্য নির্ধারণ করে গেছে। খুব বেশি পুরনো গাড়ী বলে গাড়ীর দাম তিন হাজারের বেশি দেয়া যায় না। এই তিন হাজারের চেক ভাঙিয়ে দুজনে ভাগ করে নিয়েছে। এখন অপেক্ষায় আছে আরও চেকের।

উকীল দাবী করেছে যে, সমীর ছয় মাস কাজে যেতে পারেনি এই ধাক্কার কারণে। তার সমস্ত শরীর কাজের অনুপযুক্ত ছিল। তাই কাজের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয়েছে বার হাজার ডলার। অথচ কাজ করে সমীর পায় সাত শত ডলার প্রতি মাসে। এ পর্যন্ত মোট টাকা হাতে এসেছে পনের হাজার। দু'জনে বেশ খুশি।

এবার আসবে উকিলের ফি। সে ফি সোজা উকিলের হাতে চলে গেছে। কত ডলার সেটা জানা জায়নি। তবে তাদের একটা ন্যূনতম ফি হল পাঁচ হাজার। তারপর এসেছে কায়রোপ্রেক্টরের ফি এবং আনুষঙ্গিক খরচ। প্রতি উপস্থিতির জন্য এক হাজার ডলার। ছয় মাসে যতদিন মালিশের আরাম উপভোগ করেছে তার মোট অঙ্ক। তার সাথে কিছু জিনিষ দেয়া হয়েছে সমীরকে যা কোনদিন সে ব্যবহার করেনি। তার মধ্যে ছোট দু'টা মেশিন। তা দিয়ে ঘরে বসেও আরাম করা যায় যা ডাক্তারের ভাষায় মেসেজ থেরাপী। এইসব মেশিনারি এবং সার্ভিসেস মিলিয়ে বিরাট একটা বিল ইন্সিউরেন্স কোম্পানী প্রদান করতে বাধ্য থাকে। কায়রোপ্রেক্টরের বিল থেকে ডাক্তার একটা কমিশন পায় এবং রোগি একটা কমিশন পায়। এটা নির্ভর করে কাকে কত টাকা দিয়ে রফা করা যায় তার উপর। এ থেকে সমির পেয়েছে ১০% হিসেবে নয় হাজার ডলার।

লস এঞ্জেলেসে এই ব্যবসাটা বেশ কিছুদিন চালানোর পর সেখানে পরিচিত আর কেউ বাকী নেই। তাই কোরবান নিউ ইয়র্কে এসে ব্যবসাটা চালু করেছে। এখানে এসে উঠেছে একটা ফাইভ ষ্টার

হোটেলে। যেমন উঠে বাংলাদেশের মন্ত্রীরা সরকারী খরচে সরকারী কাজের বাহানায়। খরচের কোন পরোয়া নেই। ডলার আসছে স্রোতের মত। কত আর খরচ হবে! এখানে যথেষ্ট পরিমানে ব্যবসায়ীর আমদানি আছে। অনেক দিন, অনেক টাকা। অনেক ব্যবসা। প্রতিদিন একটা অথবা দুটা। কত টাকা! কত লাভ! হাজার, লক্ষ ডলার! এমন একটা ব্যবসা প্রবাসে এই প্রথম। মাথায় বুদ্ধি থাকলে কত কিছু করা যায়! বুদ্ধিজীবিরা বুদ্ধি বিক্রি করেও কত বানায়! কোরবান এখন একজন বুদ্ধিজীবি।

মাথায় বুদ্ধি থাকলে বুদ্ধি খোলে, বুদ্ধি খেলে। কিন্তু বেশি বুদ্ধিতে মাথা ভর্তি থাকলে বুদ্ধি খোলতে পারেনা আর খেলতেও পারেনা। কোরবানের মাথায় বুদ্ধিটা সেদিন ভাল খেলতে পারেনি বলে তারা ধরা পড়ে গেল। অন্য বুদ্ধিতে বোধ হয় ভর্তি ছিল। ধরা পড়ে গেল। একজন নয়, এগার জন এক সাথে। শ্রীঘরে। ছবি সহ ঠিকানা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

পুলিশের নজরে পড়েছে এ ধরনের এক্সিডেন্টে সবগুলো গাড়ী অনেক পুরাতন। প্রত্যেকটা এক্সিডেন্টে প্রতিটি গাড়ীর একই জায়গায় মানে গাড়ীর পেট বরাবর এক্সিডেন্টগুলো সংঘটিত হয়েছে। একই ধরনের, একই পদ্ধতিতে। কোন ড্রাইভারই ব্যথা বা কোন জখম হয়নি। কোন গাড়ীতেই কোন যাত্রী ছিলনা। এইসব সূত্র ধরে পুলিশ এগিয়ে গিয়ে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে দুই ব্যবসায়ীকে। তারা সব নাম বলে দিয়েছে। এর সাথে আরও যারা জড়িত। কোরবানকে গ্রেফতার করা হয়েছে হোটেল থেকে। বিচারে যাই হোক, কোরবান বাংলাদেশে অনেক সম্পদ তৈরি করে নিয়েছে। স্বপ্ন স্বার্থক।

-৫৮-

যেদিন আনিসকে রাতে বাসায় দেখেছে সেদিন থেকে সৈয়দের মনে একটা খচখচানি শুরু হয়েছে। অফিস থেকে যখন তখন বাসায় ফোন করে। কোন দিন লতাকে পায় কোনদিন পায় না। যেদিন পায়না সেদিন রাতে যত তাড়াতাড়ি পারে ফিরে আসে। জিজ্ঞাসাবাদ চলে। কোথায় গিয়েছিলে, কেন গিয়েছিলে, এতক্ষণ কেন ইত্যাদি। প্রায় প্রতি রাতেই তাদের মাঝে তর্ক চলে। তর্কে লতার সাথে সৈয়দ পেরে উঠেনা।

সৈয়দ বুঝতে পেরেছে সে সময় দিতে পারে না বলেই লতা এদিক সেদিক যায়। সে ব্যবসার ভার কারও হাতে দিতে চায় না। কাউকে সে বিশ্বাস করে না। সে সময় দিতে না পারলেও লতাকে ব্যস্ত রাখতে হবে। সে আশরাফ সাহেবের সাথে পরামর্শ করল। আশরাফের স্ত্রী মহিলা জলসার লীডার। তাকে দিয়ে এখন থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে সৈয়দের বাসায় জলসা শুরু করল। আরও কয়েকজন মহিলা আছে। সবাইকে নিয়ে বসে ধর্মের আলোচনা, হাদিস কোরানের কথা বলা হয়। এদেশে মেয়েদের কি কি করণীয় তা শিখায়। একই কথা বার বার বলে। লতা এসব আলোচনায় বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণের জন্য বসে। তারপর কাজের ভাণ করে উঠে যায়।

সৈয়দ নিজেও নিয়মিতভাবে জলসা করা শুরু করেছে। শনিবারে হয় মহিলা জলসা আর রবিবারে পুরুষের জলসা। সৈয়দ ঠিক সময়ে চলে আসে বাসায়। উইকডেতে যখন তখন আসে। বিশেষ করে উইকএন্ডে লতাকে খুব ব্যস্ত রাখে। নিজেও বাসায় বেশি সময় কাটাতে চেষ্টা করে। লতা বিন্দুর সাথে বা আনিসের সাথে যখন তখন দেখা করতে পারে না।

বিশেষ করে উইকএন্ডে কোন সুযোগ নেই কোথাও যাবার। উইকডেতে মাঝে মাঝে দেখা হয়।

সৈয়দ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আরও কিছু কাজ নিয়ে। এসময় একটা নতুন সমিতি হয়েছে। বাড়ীর মালিক সমিতি। সভাপতি হয়েছেন সৈয়দ মুক্তাদির। টেলিফোনে বেশিরভাগ কথাবার্তা সেরে একদিন সৈয়দের বাসায় বসে কমিটি হয়ে যায়। বাহার বাড়ীর মালিক বিধায় তাকেও কল করা হয় সভায় উপস্থিত হবার জন্য। বাহার যায়নি। কিন্তু খবর রেখেছে। পরে লতার সাথে মজা করেছে বাহার। বলেছে, তোমার স্বামী তো প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে। আর চিন্তা কি?

লতাও দেখেছে বাসায় একটা মিটিং হয়েছে। সেখানে সব ধরণের মানুষ ছিল। জামাত ছাড়া এই প্রথম একটা সভা দেখে লতার মনে হয়েছিল হয়ত বা সৈয়দের মনের পরিবর্তন হয়েছে। কোন একটা সংগঠন করবে। দূরে থেকে কান পেতে শুনেছে। শুনে হতাশ হয়েছে।

লতা বলল, আমি জানি।

১৯৯৪ সালের দিকে অনেক বাঙালী বাড়ী কিনেছে। মানে রিয়েল এষ্টেট ব্যবসা। আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত ব্যবসা। তবে বাঙালীর ব্যবসাটা একটু অন্য ধরনের। অঙ্কটা আলাদা ষ্টাইলের।

বেশ কিছু কনষ্ট্রাকশন কোম্পানীর মালিক কিছু ভাঙ্গা বাড়ী কিনে মেরামত করে বিক্রি করে বা ভাড়া দেয়। কেউ নিজের জন্য বাড়ী কিনে। বাড়ী কেনার সময় দেখে নেয় বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া যাবে কিনা। বেশির ভাগ বাঙালী এ ধরনের বাড়ী কিনে। উপরে নিজেরা থাকে, আর বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়। তাতে অঙ্ক করে দেখা যায় যদি মর্টগেজ দিতে হয় পনের শ ডলার আর বেইজমেন্ট থেকে ভাড়া আসে পাচঁশ ডলার, তাহলে নিজের পকেট থেকে যাবে এক হাজার ডলার। অন্য যে কোন জায়গায় ভাড়া থাকলে বারশ' ডলারের কম পাওয়া যায় না।তিন বেডরুমের বাসা। আর এই টাকাটা যাচ্ছে মর্টগেজ প্রদানে। জমা হচ্ছে নিজের একাউন্টে। খুবই লাভজনক ব্যবসা। থাকছে আরামে, সমস্ত বাড়ী নিয়ে।

কিন্তু মাঝে অঙ্ক ভুল হয়ে যায়।

বাঙালীরা সাধারনত বাঙালির কাছেই ভাড়া দিতে চায়। আর বাঙালীও বাঙালীর বাড়ীতে ভাড়া থাকতে চায়। তাই অনেক সময় কোন এগ্রিমেন্ট ছাড়াই ভাড়া দেয়া হয়। বাঙালী তো আর বাঙালীর সাথে বেঈমানি করবেনা! তারপরও বেঈমানি হয়ে যায়। হয়ে গেছে। একটা নয়, কয়েকটা ঘটনা হয়ে গেছে।

পল্টু ভাই ভাড়া দিয়েছে কয়েকজন বেচেলরের কাছে। বেচেলররা ভাড়া বেশি দেয়। কয়েক মাস পরই ভাড়া বন্ধ। দিব দিচ্ছি করে দুমাস ভাড়া নেই। তারপর কথা কাটাকাটি, পরে হাতাহাতি। বাড়ীওয়ালাকে যথেষ্ট পরিমানে উত্তম মধ্যম দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বলে দিল, ভাড়া পাবেন না। যা পারেন করেন গিয়ে!

এদেশে টেনেন্ট ল্যান্ডলর্ড এক্ট খুব মজার। এই বেচেলররা সেটা জেনে গেছে। বুঝে গেছে ভাড়া না দিলে কিছুই করতে পারবে না। কারণ কোর্ট সব সময় ভাড়াটিয়ার পক্ষে রায় দেয়। বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করতে গেলে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। এই কয়েক মাস তো ভাড়া না দিয়ে থাকা যাবে! পরে দেখা যাবে কি হয়।

এখন প্ ভাই ভাড়াটিয়াকে কিছু বলতে পারবেনা। যদি কিছু বলে তাহলে বিপদে পড়বে। যদি ভাড়াটিয়া মামলা করে যে আমাকে ভয় দেখিয়েছে তাহলে নির্ঘাত জরিমানা বা জেল। আর উচ্ছেদ করতে গেলে

আদালতে যেতে হবে। আদালতে যাবার দুরকম পথ আছে। একটা কাঁচা রাস্তা মানে নিজে সরাসরি হাকিমের কাছে যাওয়া। সরাসরি মামলা করা। তাতে সামান্য কোর্ট ফি দিতে হয়। আর পাকা রাস্তা মানে উকিলের মাধ্যমে গেলে আগেভাগে তার ফি কম পক্ষে পাচঁশ ডলার দিতে হবে। প্লভাই হিসাব করছে কোন্ পথে যাবে। কাঁচা রাস্তায় গিয়ে কাঁচা কাজ করলে, আইনের সুক্ষ মারপ্যাঁচগুলো না জানলে মামলা হেরে যাবার সাম্ভাবনা আছে। একবার হেরে গেলে ভাড়াটিয়া কতদিন থাকবে কে জানে! তাই পল্টুভাই ঠিক করল পাকা রাস্তায় যাবে। তবে পাকা রাস্তায়ও উঁচুনিচু আছে। কোন উকিলের ফি এক হাজার, কোন উকিল পাঁচশ, কোন উকিল কন্ট্রাক্ট নেয়। শেষ পর্যন্ত পাঁচশ ডলারে উকিল নিয়োগ করল। প্রথম পাঁচশ ডলার, তারপর প্রতি হাজীরাতে পাঁচ শ দিতে হবে। এখন নির্ভর করবে মহামান্য আদালত কতটা তারিখের পর মামলা নিস্পত্তি করবে। সব সময় আদালতের ইচ্ছার উপরই নিস্পত্তি নির্ভর করে না। ভাড়াটিয়ার অবস্থার উপরই নির্ভর করে।

পল্টু ভাইর বরাত ভাল। আসামীরা সময় চায়নি। হাজিরা দিয়েছে এক মাস পরের দেয়া তারিখে। শুনানী শেষে আর একটা তারিখ দিল আরও পনের দিন পর। সেই তারিখে মাননীয় আদালত রায় দিলেন এই চার মাসের ভাড়া দিয়ে ভাড়াটিয়া চলে যাবে।

পরের মাসে ভাড়াটিয়া চলে গেল ঠিকই কিন্তু কোন ভাড়া দিয়ে যায়নি। আর এই চার মাসের ভাড়ার জন্য পল্টু ভাই ধাওয়া করতে রাজি হয়নি। এখানে লাভ হল উকিলের আর ভাড়াটিয়ার। পল্টু ভাইর হিসাব বেহিসাব হয়ে গেল। উকিলকে দিল এক হাজার, ভাড়া ৫০০ ডলার হিসাবে ২ হাজার মোট গেল তিন হাজার।

শুধু বেচেলরই নয়, পরিবার নিয়ে থাকে এমন কয়েকটা ঘটনাও হয়ে গেল। বাড়ীওয়ালার কিছু করার থাকে না। সামান্য ছুতায় ভাড়া বন্ধ। এসব জানাজানির পর বাড়ীওয়ালারা বাঙালীর কাছে ভাড়া দিতে চায় না। এবার বিদেশীর কাছে। কালোদের কাছে ভাড়া দেয়া বিপদজনক। এশিয়ান প্রায় সবাই বাঙালীর মত। তাই সাদাদের কাছে ভাড়া দেয়া ঠিক করল পল্টু ভাই।

আর এক বাড়ীর মালিক রহমান। বেইজমেন্ট ভাড়া হবে। নিউইয়র্ক পোষ্টে বিজ্ঞাপন দিল। পঁচিশ ডলার খরচ করে। পরের দিন অনেক মানুষ ফোন করল, সরেজমিনে বাড়ী দেখতে এল। রহমান বাছাই করছে। কালো, সাদা, এশিয়ান। সাদাকেই ভাড়া দিবে মনে মনে ঠিক করেছে। একটা পরিবার এল। স্বামী স্ত্রী আর তিনটা ছোট ছোট ফুট ফুটে বাচ্চা। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে হয়। মহিলা খুবই সুন্দরী। লম্বা ছ'ফুট, ছিপছিপে। স্পেনের লোক। মনকাড়া হাসিটি মুখে লেগে আছে। নাম বলল তেরেসা। স্বামী একটা ইলেকট্রিক কোম্পানীতে চাকরি করে। সাথে চিঠি নিয়ে এসেছে। রহমানের একটু আলুর দোষ আছে। মহিলাকে দেখেই তার পছন্দ হয়ে গেল। একবারেই রাজি। তারা প্রথম এবং শেষ মাসের ভাড়া দিয়ে একটা রশিদ নিয়ে চলে গেল। পরের দিন সব মালামাল নিয়ে বাড়ীতে এসে উঠল।

মালামাল বলতে তাদের পুরণো দু'টো বেড আর বাচ্চাদের কাপড়চোপড়। একটা পরিবারে এত কম জিনিষ থাকে এই প্রথম দেখল রহমান। রহমান যতটুকু পারে তাদের তদারকি করল। কিন্তু মহিলার মুখে আগের মত হাসিটি আর দেখা যায় না।

মাসের শেষে ভাড়া আনতে গেলে মহিলা একটা তারিখ দিল। তারপর মাস শেষ হয়ে গেল। ভাড়া নেই। আবার তারিখ দিচ্ছে। রহমান প্রমাদ

গণল। লক্ষণ তো ভাল নয়! পরের মাস চলে যাচ্ছে, ভাড়া নেই। এইবার রহমানের অঙ্কে গরমিল হয়ে গেল। উকিলের কাছে গেল। ৫০০ ডলার দিয়ে মামলা ঠুকল। মামলার তারিখ পড়ল। এক মাস পরে।

নির্দিষ্ট তারিখে তেরেসা উপস্থিত হয়নি। অসুখ বলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়েছে। আর একটা তারিখ দিল আর এক মাস পর।

তেরেসার স্বামীকে খোঁজে রহমান। নাই। তার পরিবর্তে প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষ আসে। এক দুদিন থাকে। আবার চলে যায়। দুটা লোক থাকে, তেরেসা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তার ভাই। একদিন তেরেসাকে রহমান জিজ্ঞেস করল, তোমার স্বামী কোথায়?

তালাক হয়ে গেছে। সে আর আসবে না।

তোমার দু ভাই ছাড়া এখন আর একজন দেখি সে তোমার কে?

গেষ্ট।

কয়দিন থাকবে?

এক সপ্তাহ।

এক সপ্তাহ পরে আবার জিজ্ঞেস করায় বলল, তার সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে।

এখন রাতদিন নতুন মানুষ আসে, আর যায়। দরজা থেকে কিসের ছোট প্যাকেট নিয়ে যায়, লেন দেন হয়। রহমান দেখে।

পরের তারিখে তেরেসার বাচ্চার অসুখ। কোর্টে যেতে পারেনি।

এখন খোলাখুলিভাবে চলছে। বেচাকেনার ব্যবসা। হেরোইন বেঁচাকেনা। তেরেসার দু ভাই, তেরেসার বন্ধু সবাই মিলে একটা হেরোইনের ব্যবসা খুলে বসেছে। পুলিশ জানে এখানে ব্যবসা হচ্ছে। কি কারণে অভিযানে নামছেনা জানা যায়নি। রহমান ভয় পাচ্ছে পুলিশকে খবর দিতে। তার একটা বার বছরের মেয়ে আছে। যদি কোন ক্ষতি করে! তাই সে ভালয় ভালয় তাদের উচ্ছেদ করতে পারলেই বেঁচে যায়।

দুদিন পর পর নতুন নতুন লোক আসে, দুতিনদিন থেকে চলে যায়। ব্যবসা চলছে! দেহ ব্যবসা এবং হেরোইন ব্যবসা।

অবশেষে চতুর্থবারে আদালতে হাজিরা দিল তেরেসা। তার বক্তব্য, এই নভেম্বর মাসে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে সে কোথায় যাবে! তাছাড়া সে গর্ভবতী। তাকে আরও দু'মাস সময় দেয়া হোক।

রহমানের উকিল যুক্তি দেখাল, রহমান তোমাকে গর্ভবতী করেনি। যার বাচ্চা তার মাথা ব্যথা। রহমানের নয়। অতএব তাকে উচ্ছেদের আদেশ দেয়া হোক। আদালত উচ্ছেদের আদেশ জারি করল।

আদেশ জারি করলেই উচ্ছেদ হয়না। এই আদেশ যাবে জেলার শরীফের অফিসে। শরীফ এসে উচ্ছেদ করবে। অবশ্য এক মাসের নোটিশ দিয়ে শরীফ ভাড়াটিয়াকে জানাবে কোন্ দিন কোন্ তারিখে সে আসবে। এই তারিখ নির্ভর করে শরীফের কর্ম ব্যস্ততার উপর। যদি তিনি বেশী ব্যস্ত থাকেন তাহলে এই উচ্ছেদ দু মাস বা তিন মাসও হতে পারে। এই দিন তারিখটা স্থির করে শরীফের সেক্রেটারী। সেক্রেটারী আবার দয়ালু। ভাড়াটিয়ার পক্ষে তিনি কাজ করেন। ভাড়াটিয়া তার কাছে ধর্না দিয়ে দু চারশ ছাড়লেই তিনি এই উচ্ছেদের তারিখ দু তিন মাস পিছিয়ে দেন। তাতে ভাড়াটিয়া চার পাঁচশ ডলার সেক্রেটারীকে দিলেও লাভবান।

তেরেসা সেই সেক্রেটারীকে চিনে। অতীতেও তার এসব কাজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। অনেক লেনদেন হয়েছে। এরা একটা সংঘবদ্ধ দল। ভাড়া ফাঁকি দেবার যত ফন্দি তারা জানে। কোন কাজ কিভাবে

করতে হয় সবকিছু তাদের নখদর্পনে। যত বাড়ীতে সে ভাড়া ছিল সব জায়গা থেকেই উচ্ছেদ হয়েছে। আর সেক্রেটারী সব জানে। তেরেসার উচ্ছেদের নোটিশ দয়া করে দু'মাস সময় দিলেন।

সেই দু' মাস পর যেদিন উচ্ছেদ হবে সেদিন সকালে তেরেসার দু ভাই মিলে পানির হিটার ছিদ্র করে দিল, বেইজমেন্টে একটা এয়ার কন্ডিশনার ছিল রহমানের কেনা, সেটা খুলে নিয়ে গেল। বলল, ওটা তেরেসার। জানালা ভেঙ্গে ফেলল, ইলেট্রিক মিটার ভাঙ্গল। রহমান সব দেখল। একটা পুতুলের মত। কিছু করার নেই। কিছু বললেই মারামারি হবে অথবা মামলা হবে।

ওরা চলে গেলে রহমান দেখল এই বেইজমেন্ট ঠিক করতে তার প্রায় ছয় হাজার ডলার লাগবে। পানির মিটার তিন হাজার, দেয়াল, দরজা, জানালা সব নতুন করে করতে হবে। তার সাথে ছয় মাসের ভাড়া। সব মিলে বিরাট একটা অঙ্ক। সবই অঙ্কের গরমিল। বাড়ী ভাড়া ব্যবসায় লাভ ক্ষতির হিসাব।

প্রায় তিন মাস পর রাতে টেলিভিশন দেখছিল রহমান। হঠাৎ দেখে সেভেন চেনেলে তেরেসার ইন্টারভিউ হচ্ছে। তিনি এখন একটা ফাইভ ষ্টার হোটেলে। সরকারী মেহমান। তিনি যে বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন তাতে আগুন লেগে তার সব কিছু পুড়ে গেছে। ভাগ্যিস তার বাচ্চারা সহি সালামতে বেঁচে আছে। তার কোন থাকার জায়গা নেই বলে জরুরী ভিত্তিতে সরকার এই হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছে। রহমান তার স্ত্রী ও মেয়েকে ডেকে দেখাল খবরটা। বলল, এরা বেঁচে যায় সবকিছু করেও। যার বাড়ীতে ছিল তার বাড়ীটাও পুড়িয়ে দিয়ে গেল!

তারপরই একটা সমিতি করার প্রয়োজন অনুভব করল বাড়ীর মালিকেরা। রহমানের উদ্দোগেই এই সমিতির জন্ম। বাঙালী সব বাড়ীওয়ালার ফোন নাম্বার নিয়ে যোগাযোগ করেছে। এর মাঝে সৈয়দ সাহেবই সবচেয়ে বেশি বাড়ীর মালিক। এগারটা। একটা কমিটি গঠন করে ভাড়া দেবার কিছু নিয়ম কানুন তৈরি হল। যাতে ভবিষ্যতে ভাড়াটিয়ার হাতে কম নাজেহাল হতে হয়।

এখন সৈয়দ তার নিজের ব্যবসা ছাড়াও কিছু কাজ হাতে নিয়ে ব্যস্ত রইল।

-৫৯-

বরবাদি এবার চালান করেছে নিজের ছেলে মোহাম্মদ ফয়েজুর রহমানকে। এতদিন তিনি তার মুরিদান বা পেয়ারের মানুষকে এই নাছারার দেশে আসার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। কি ভাবে যে তিনি সাহায্য করেন, তার যোগাযোগ কার সাথে, কি ভাবে ভিসার ব্যবস্থা করেন তা কেউ জানে না। নিজের ছেলে ফয়েজের লেখা পড়া একটু বাকী ছিল। শেষ হতেই তিনি চালান করে দিয়েছেন কাফেরের দেশে ইসলাম ধর্মকে পোক্ত করার জন্য। সব ব্যবস্থা হবার পর বরবাদি ফোন করল তার সবচেয়ে পেয়ারের ভক্ত জামালকে। জামালের নিজের বাড়ী। এখানে ফয়েজের থাকার খুব সুবিধা হবে। তাছাড়া জামালের বউটা খুব খোদাভক্ত, কর্মট। সেবা যত্নের কোন ক্রুটি হবে না। দেখতেও সুন্দরী।

জামাল যেদিন খবরটা পেল সেদিন থেকেই তার ঘরে একটা সাজ সাজ রব। তার স্ত্রী আমেনা ছোট হুজুরের জন্য নতুন বিছানা, চাদর, কম্বল ইত্যাদি জমা করা শুরু করল। হুজুর কোন্ ঘরে থাকবে সেটা নিয়ে

একটু কথাবার্তা হল। সিদ্ধান্ত হল বাচ্চাদের পাশের রুমেই হুজুর থাকবেন।

যেদিন ছোট হুজুর এয়ারপোর্টে তসরিফ নিলেন সেদিন কেনেডি এয়াপোর্ট হাসিতে উজ্জ্বল ছিল। সকালের সবুজ রং নীলাকাশের জ্বল জ্বলে রৌদ্রের সাথে মিশে সবুজ-স্বর্নালী রূপ ধারন করেছে। জামালের পরিবার অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ছোট হুজুরের সাথে আগে কোন দিন জামালের মোলাকাত হয়নি। ইমিগ্রেশন শেষে যাত্রী সব বেরিয়ে আসছে। কয়েকজন বাঙালী যাত্রীও বেরিয়ে আসছে। সকলের হাতে পোটলাপুটলি ভর্তি। কত রকমের জিনিষ নিয়ে এসেছে প্রবাসে আপনজনের জন্য। কত রকমের খাদ্য। যদিও এখানে সব পাওয়া যায়। তার মধ্যে একজনকে দেখে চিনতে অসুবিধা হয়নি। তিনিই যে ছোট হুজুর তাতে সন্দেহ নেই। দেখতে হুবুহু বড় হুজুরের মত চেহারা। লেবাস একদম বড় হুজুরের মত। তবে চেহারাটা খুব মায়াময়। কচি কচি মোলায়েম। মুখে পাতলা দাড়ি। মনে হয় দাড়ি গজানোর পর আর হাত দেননি। বয়স আর কতই হবে! বাইশ তেইশ। এত বড় জার্নির পর তিনি একবারে শ্রান্ত। কাছে আসতেই জামাল জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ছোট হুজুর?

ছোট হুজুর 'জ্বি' বলতেই জামাল কদমবুসি করল। একটা এটাচি জাতিয় ব্যাগ হুজুরের হাতে ছিল। জামাল তাড়াতাড়ি হুজুরের হাত থেকে নিয়ে শাহান শাহের মত হাতে ইশারা করে গেইটের সামনে গিয়ে বলল, আপনারা এখানে একটু দাড়ান। আমি গাড়ী এখানে নিয়ে আসি। হুজুর এতটুকু হাটতে পারবেন না। এই ফাঁকে আমেনা কদমবুসিখানা সেরে নিল।

ছোট হুজুরের সাথে আর কোন মালামাল নেই। দুদিনের দুনিয়ায় বেশি জিনিষপত্র দিয়ে কি হবে। তিনি যে জামালের বাসায় উঠবেন তা আগে থেকেই স্থির করা আছে। জামালের জন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু না এনে তিনি নিয়ে এসেছেন বড় হুজুরের দোয়ার ভান্ডার। পার্থিব জগতের কোন জিনিষের উপরই হুজুরের মায়া মহব্বত নেই। তাই জামালের জন্য আখেরাতের সম্পদ প্রেরন করেছেন। জামাল গাড়ী নিয়ে এল। হুজুরকে দরজা খুলে দিয়ে বসতে সাহায্য করল। হুজুর গাড়ীতে বসে প্রথম কথা বললেন, আব্বাজান বলেছেন কোন লাগেজ নেবার প্রয়োজন নেই। জামালই সব ব্যবস্থা করবে। তাই কিছুই আনিনি।

জামাল তাড়াতাড়ি বলল, তাহলে আমরা আছি কেন? এখানে সব পাওয়া যায়। কিছু সৌদি দোকান আছে। সেখানে তোপ, কোর্তা, পায়জামা, টুপি, সৌদি রুমাল, ছুরমা, আতর ইত্যাদি সব পাওয়া যায়। আপনার যখন যা লাগে শুধু বলবেন। সাথে কিছু আনেন নাই, ভাল করেছেন। ঘরে কয়েকটা নতুন লুঙ্গি আছে। আপনার যে কয়টা লাগে ব্যবহার করতে পারেন। পায়জামাও আছে। কোন অসুবিধা হবে না। তারপর জিজ্ঞেস করল, বড় হুজুর মানে বরবাদির শরীর গতর খানা কেমন আছে?

ভাল আছে। আপনাদের জন্য দোয়া করেছেন।

ঘরে এসে হুজুরের খাবারের তদারকি করছে জামাল। হুজুর কোন্ কোন্ জিনিষ পছন্দ করেন তা কিছুই জানেনা বলে নিজকে অপরাধি মনে হল। আমেনাকে বলল, যত রকম পার সব রকম তৈরি করবে কাল থেকে। তারপর তুমি নিজে বসে খাওয়াবে। তখন নিজেই বুঝতে পারবে হুজুর কোন জিনিষ খেতে পছন্দ করেন।

সেভাবেই চলল খেদমত। আমেনা এখন দুদিন কাজ করে। বাকী দিন শুধু হুজুরের খেদমতে ব্যস্ত থাকে। খাওয়ার সময় হুজুরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, এক পাও নড়েনা।

খবর গোপন থাকেনি। বরবাদী ভক্তদের মাঝে খবর ছড়িয়ে গেল। ছোট হুজুর তসরিফ নিয়েছেন। সোজাসোজি জামালের বাসায়। তারা ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল। সব ছওয়াব ডাইরেক্টলি চলে গেল জামালের খাতায়। তারা অন্য পথ ধরল ছওয়াব হাইজাক করার জন্য।

অনেকেই আসতে লাগল ছোট হুজুরের সাথে মোলাকাত করার জন্য। আশরাফুজ্জামান এবং সৈয়দ সাহেবও এলেন। মোসাবিতা করে, হুজুরের দোয়া খায়ের কামনা করে দাওয়াত করে গেলেন। অন্তত একদিন যেন তিনি তশরিফ রাখেন সৈয়দের বাসায়। তিনি এখন শ্রান্ত। বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি এই কাফেরের দেশে থাকার নিয়ত করেই এসেছেন। বিশ্রাম শেষ হলেই তানার একটা কাজের প্রয়োজন। কে হুজুরকে কাজ দিতে পারবে? সহজ কাজ। যে কাজ দিতে পারবে সেই ছওয়াব হাইজাক করতে পারবে।

এক সপ্তাহ পর তিনি সৈয়দের বাসায় তসরিফ নিলেন। এর আগে হুজুর সম্মন্ধে লতা কিছুই জানত না। হুজুর যখন ঘরে পদধূলি দিলেন তখনই সৈয়দ লতাকে বলল, হুজুর যে কয়দিন ইচ্ছে থাকবেন আমাদের এখানে। শুনে লতা বিরক্তিতে মুখ কুচকাল। সৈয়দের নজর এড়ায়নি।

এই সুখবরটা লতা আনিসকে দিল। আনিস ফোনে বলল, যদি দুজখে যেতে চান তাহলে তার খেদমত করুন। আর না হয় আগের ফর্মুলা প্রয়োগ করুন।

কি জানি কি কারণ, হুজুর একদিন পরেই চলে গেলেন আশরাফের বাসায়। সেখানেও একদিন। তারপর জামালে বাসায়। ওখানেই খেদমত ভাল হয়।

আহাম্মদ আলী এখন কাজ করে একটা পার্কিং লটে। একদম সোজা কাজ। সে মরিয়া হয়ে উঠল হুজুরকে তার এখানে কাজ দেবার জন্য। সে তার মালিকের সাথে কথা বলল। মালিক বলল এখন যে সব কর্মচারি আছে তাতেই চলে। নতুন লোক নেবার প্রয়োজন নেই। শুনে আহাম্মদ আলী নিজের কাজটা ছেড়ে দিয়ে এই জায়গায় হুজুরকে দেয়া যায় কিনা চিন্তা করতে লাগল। মাথায় বুদ্ধি এল। একটা কাউলা কাজ করে সকালের শিফটে। এটাকে সরাতে পারলেই জায়গা হয়ে যায়। ফন্দি আঁটতে লাগল।

এই পার্কিং লটে চুরির যথেষ্ট সুযোগ আছে। গাড়ী পার্কিংএর জন্য প্রতি ঘন্টায় পয়সা দিতে হয়। স্থান বিশেষে রেইট উঠানামা করে। তবে মিনিমাম হল পাঁচ ডলার। টেক্স সহ প্রায় ছয় ডলার। কোন কোন গাড়ী কয়েক ঘন্টা থাকে। অনেক কাষ্টমার টেক্স ফাঁকি দেবার জন্য রিসিট নেয় না। যে সব গাড়ীর রিসিট নেই সে সব পার্কিংএর কোন রেকর্ড নেই। কাজেই পুরো টাকাটা পকেটে রাখা যায়। এসব জেনেই আহাম্মদ আলী অনেক দিন চেষ্টার পর কাজটা পেয়েছে। এখন হুজুরকে এখানে কাজ দিতে পারলে খুবই ভাল হয়। অল্প দিনেই বেশ কিছু পয়সা বানাতে পারবে।

দুদিন পর আহাম্মদ আলী মালিকের কাছে গেল। বলল, স্যার, সকালে যে ক্রিস্টোফার কাজ করে সেখানে কিছু চুরি হয়। আমি বিকালে এসে দেখেছি দুটা গাড়ীর রিসিট নেই। অথচ গাড়ীর ডেস বোর্ডে পেইড লেখা আছে। এ দেশে হায়ারিং ফায়ারিং মিনিটের ব্যাপার। মালিকের আগেই সন্দেহ ছিল এই ক্রিস্টোফারের উপর। এবার আহাম্মদ আলী বলার পর

সে নিশ্চিন্ত হল এবং পরের দিন ক্রিস্টোফারকে বলল, আগামী কাল কাজে এসো না। যখন দরকার হবে তখন তোমাকে কল করব। কিন্তু ক্রিস্টোফারকে কোন দিন কল করেনি।

তার পরিবর্তে ছোট হুজুর কাজ পেয়ে গেলেন। কার রিজিক কোথায় লেখা আছে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না! সবই আল্লাহর হুকুম। আর আহাম্মদ আলী সমস্ত ছওয়াব হাইজাক করে ফেলল। হুজুরকে এই উপকার করার জন্য কত লক্ষ নেকী পাওয়া যাবে তার হিসেব তারা জানে। সেগুলো খাতা কলম ছাড়া হবেনা।

আহমদ আলী হাইজাক করলেও কিছু বাকি রয়ে গেছে। হুজুরের থাকা খাওয়া সেবা যত্নের সমস্ত দায়ীত্ব জামাল এবং তার স্ত্রীর হাতে। এই সেবা যত্নের জন্য কত লক্ষ ছওয়াব হবে সেটা জামাল জানে। এদিকে হুজুরের একটা পয়সাও খরচ নেই। জামালের স্ত্রী প্রতিদিন হুজুরের জন্য লাঞ্চ রেডি করে টিফিন বক্সে দিয়ে দেন। শুধু আসা যাওয়ার সাব ওয়ের ভাড়াটা লাগে। আল্লাহর খাস বান্দা সব সময় মিতব্যয়ী। অমিতব্যয়ী মানুষ আল্লাহর শত্রু!

-৬০-

১৯৯৬ পর্যন্ত সাহিত্য পরিষদ মুখরিত হয়ে উঠে এক ঝাক তরুন কবি সাহিত্যিকের পদচারণায। যোগদান করেন একদল প্রবীণ কবি সাহিত্যিকও। তাদের প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত হয়ে ওঠে সাহিত্য পরিষদ তথা নিউইয়র্ক শহরে বাঙালীর সাহিত্যচর্চা। এই কয় বছর সাহিত্য পরিষদে তাদের নিয়মিত যাত্রা তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায় নিজেদের সৃষ্টিকে ধরে রাখার দিকে। একটার পর একটা প্রকাশিত হতে থাকে তাদের সৃষ্টি। প্রবাসে সাহিত্য সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় নিউইয়র্ক শহর। এই নবীণ প্রবীণ কবি সাহিত্যিকের প্রকাশনার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা (সম্পুর্ন নাও হতে পারে) যতটুকু যোগাড় করা হয়েছে তা থেকে এই একটা তালিকা তৈরি করা যেতে পারে।

কবি শামস আল মমীনের কবিতা গ্রন্থ 'চিতায় ঝুলন্ত জ্যোৎস্না' প্রকাশিত হয়েছে তার সৃষ্টি নিয়ে। পেশায় শিক্ষকতা এই কবির কবিতা প্রাণবন্ত হয়ে মনকে নাড়া দিয়ে যায়। কবি শামস আল মমীনের প্রতিটি কবিতা জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা বা বস্তুকে নিয়ে রচিত। প্রতিটি কবিতা একটি জীবন্ত আবেদন নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়।

তরুন কবি মোহিত চৌধুরীর 'আমেরিকায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি'। এই নায়কোচিত চেহারার কবি তুলে ধরেছেন উত্তর আমেরিকায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের কৃতি ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। তিনি একটা সত্যিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। তার প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ 'সানাই কথা বললো না' প্রকাশিত হয় ১৯৯৩র বই মেলায়।

কবি, ছড়াকার সোহেল হামিদ রচিত 'ছন্দ' একটি অনন্য ছড়া পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাতে দেশে বিদেশের অনেক ছড়াকারের ছড়া নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এই ছন্দ।

কবি আবু সাইদ শাহীন সম্পাদনা করেন একটি কবিতা পত্রিকা 'শঙ্খচিল'। উত্তর আমেরিকার কবিদের কবিতা নিয়ে এই পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হয়।

কবি শামস আল মমীন সম্পাদিত একটি কবিতা বিষয়ক কাগজ বের হয় 'আকার ইকার' নামে। এই কাগজে স্থান পেয়েছে অনেক দেশি বিদেশির কবিতা ও অনুবাদ।

কাজী ফয়সল আহম্মদ সংকলন প্রকাশ করেছেন '১৪০০ সাল'। ১৪০০ সালকে বরণ করার মানসে তিনি এই গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন অনেক কবি সাহিত্যিকের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ছড়া ইত্যদি।

কবি ফারুক আজম একজন ডাক্তার, আবৃত্তিকার, গল্পকার ও প্রবন্ধকার। একজন দক্ষ অভিনেতা, একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। তার কবিতা সৃষ্টির উল্লাস নিয়ে প্রকাশিত হয় 'আমি ও আকাশ' নামে। তার প্রতিটি কবিতার একটা আলাদা আবেদন পাঠককে বিমুগ্ধ করে।

কবি হাসান আল আব্দুল্লা অংক ভুল করে দিয়েছে। স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক সারদা বাবুকে কোনদিন হাসতে দেখিনি। তাই দেখে বদ্ধমূল ধারনা হয়েছে অঙ্কের শিক্ষকরা বা ছাত্ররা হাসতে জানেনা। তাদের ভিতরটা অঙ্কের মত বিদঘুটে। কিন্তু হাসান একজন অঙ্কের ছাত্র এবং শিক্ষক হয়ে ছন্দ নিয়ে গবেষনা, কবিতা রচনা, এবং উপন্যাস লিখে সেই অংক ভুল প্রমাণিত করেছে। একজন উদীয়মান সম্ভাবনাময় কবি। তার কাব্যগ্রন্থ একটার পর একটা প্রকাশিত হচ্ছে। তার কাব্য গ্রন্থ 'একবিংশ শতাব্দীর আগে' পাঠকের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কবি ফকির ইলিয়াস তার বিয়েতে প্রকাশ করেন 'মোহনা' নামে একটি সংকলন। দেশে বিদেশের অনেক কবির রচনা সম্ভারে এই রুচিশীল সংকলনটি পাঠককে আকৃষ্ট করে।

আলম খোরশেদ মূলত একজন অনুবাদক। স্পেনিশ ভাষা এবং সাহিত্যের উপর তার যথেস্ট দখল আছে। তার কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থের একটি হল 'দূর দিগন্তের ধ্বনি'। পৃথিবীর বিখ্যাত ১৬ জন কবির কবিতার অনুবাদ এই গ্রন্থটি বাংলাদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

গল্পকার মোজাম্মেল হোসেন মিন্টুর প্রথম উপন্যাস 'বিবর্ণ সময়' প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। আরও দুটি প্রকাশের পথে।

প্রবীন সাহিত্যিক মোহন গোমেজের ঝং ধরা সাহিত্য চর্চায় আবার রং ধরেছে। নিয়মিত সাহিত্য পরিষদে উপস্থিত হবার ফল স্বরূপ তাঁর গল্প গ্রন্থ 'ঋণাঞ্জলি'। ৯টি গল্পের সমাহারে এই গ্রন্থটি বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সাহিত্য পরিষদের আর এক সদস্য কবি জোহরা হাসীনের কবিতা গ্রন্থ 'সূর্যোদয়ের জন্য' প্রকাশিত হয় তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে। তার প্রতিটি কবিতা যেন নতুন কিছু নিয়ে পাঠকের কাছে হাজির হয়।

প্রকাশিত হয় এম, বাহাউদ্দিনের গল্পগ্রন্থ 'বিবিসাব'।

তাছাড়াও দুটি সাহিত্য পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। একটি শিকদার হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত 'অভিবাস' অন্যটি এম বাহাউদ্দিন সম্পাদিত 'দৃষ্টান্ত'. এই দুটি রুচীশিল সাহিত্য পত্রিকা পাঠকের বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

আরও যারা নিজেদের বই প্রকাশ করেছেন তারা হলেন নাসরিন চৌধুরী, আলেয়া চৌধুরী, বদিউস সালামের 'প্রবাসে/মৃত্যুর আগে', কবিতা গ্রন্থ। ড: ফয়সল খানের 'অন্যরকম যুবক', মমতাজ ওয়াদুদের কয়েকটি গল্প গ্রন্থ ও জাহানারা আখতারের কবিতা গ্রন্থ।

এম এ খালেক একজন প্রবীন কবি। তিনি সাহিত্য পরিষদের একজন নিয়মিত সদস্য। ১৯৯০ সালে ক্যালিফোর্নিয়াতে অনুষ্ঠিত ইংরেজি কবিতা প্রতিযোগিতায় এওয়ার্ড অব মেরিট পুরষ্কারে ভুষিত হন। লাস

ভেগাসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড অব পোয়েট্রি প্রতিযোগিতায় তাঁকে গোল্ডেন পোয়েট হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

এপার বাংলা, ওপার বাংলা থেকে যে সব কবি সাহিত্যিক ভ্রমনে আসেন সাহিত্য পরিষদ তাঁদের সন্মানে বিশেষ আসরের ব্যবস্থা করে থাকে। দু বাংলা থেকে আগত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যাঁরা সাহিত্য আসর অলঙ্কৃত করেছেন তাঁরা হলেন: কবি শামসুর রাহমান, কবি সিকদার আমিনুল হক, কবি সুভাস মুখোপাধ্যায়, পন্ডিত শিব নারায়ন রায়, প্রবন্ধকার, লেখক বদরউদ্দিন ওমর, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, একুশে গানের রচয়িতা স্বনামধন্য কলামিষ্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরী, কবি মো: রফিক, বিখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ও সকলের পরিচিত হুমায়ূন আহমেদ প্রমুখ।

-৬১-

বরবাদির ফাজিল পাশ ছেলে মোহাম্মদ ফয়েজুর রহমান আরাম আয়েসে আমেনার তত্ত্বাবধানে এবং সেবা যত্নে দিনাতিপাত করছে। এই এক বছরে আমেনা ছোট হুজুরের মেজাজ শরীফ কখন কি রকম থাকে তার একটা ফর্দ তৈরি করে ফেলেছে। ইদানিং কালে তিনি যথেষ্ট বয়ান করেন। মিন মিনে ভাবটা কেটে গেছে অনেক দিন। মুখ যথেষ্ট চলে। আমেনা অপেক্ষা করে হুজুর কখন কাজ থেকে ফিরবেন। হুজুর ফেরার সাথে সাথেই এক গ্লাস সরবত পেশ করেন। হুজুর রুহ আবজা শরবত পছন্দ করেন। পাকিস্তানী গ্রোসারীতে রুহ আবজা পাওয়া যায়। জামাল প্রতি সপ্তাহে একদিন পাকিস্তানী গ্রোসারীতে যায় হুজুরের পছন্দনীয় জিনিষ আনার জন্য। শরবত পান করার পর হুজুর বিশ্রাম নেন। আমেনা কাছাকাছি থাকে, হুজুরের কখন কি প্রয়োজন হয় তাই। হুজুরের ডিউটি হল মাঠের মাঝখানে গ্লাস দিয়ে তৈরি ছোট একটা ঘুমটি ঘর। তিন হাত বাই তিন হাত। সেখানে কোন হিটের ব্যবস্থা নেই। আলাদা একটা হিটার থাকে। কিন্তু মায়নাস তিরিশ বা চল্লিশ যখন হয় তখন ছোট হিটারে শীত মানে না। তিনি মাঝে মাঝে কাপতে থাকেন। শীতটা তিনি সহ্য করতে পারেন না।

বিছানায় শুয়ে তিনি আমেনাকে তার কাজের কথা বলেন, কষ্টের কথা বলেন। আমেনা মন দিয়ে শোনে এবং সান্তনা দেয়। মাঝে মাঝে হুজুরের প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয়। আমেনা খুব দরদ দিয়ে মাথাটা টিপে দেয়, মলম লাগিয়ে দেয়।

হুজুর বয়ান করেন। কত রকম হাদিস জানেন তিনি! আমাদের নবী করিম কত বয়সে বিবি খাদিজাকে শাদি করলেন, কি তার মাজেজা, কেন করলেন, আল্লাহর আরশে তখন কি হচ্ছিল এ সব তিনি বয়ান করেন। তিনি কোন অবস্থায় কোন কোন নিকাহ করতে বাধ্য হলেন সব ব্যাখ্যা করেন। আমেনা মন দিয়ে শোনে।

হুজুরের কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই। তিনি যা রোজগার করেন সব আমেনার হাতে জমা হয়। কোন খরচ নেই। এই এক বছরে হুজুরের জমা হয়েছে প্রায় বার হাজার। তার মাঝে তিনি তার আব্বাজানের খেদমতে পাঠিয়েছেন মাত্র আট হাজার। অথচ তিনি কাগজে কলমে বেতন পান মাসে নয় শত ডলার। এত টাকা ক্যাশ আমেনার হাতে কোন দিনই আসেনি। মাঝে মাঝে গুনে দেখে।

জামাল সারাদিন শুকরের মাংশের সেন্ডুইচ বিক্রি করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে রাত দশটায় দোকান বন্ধ করে ঘরে ফেরে। ঘরে ঢুকেই

হুজুরের খবর নেন। হুজুরের শরীর গতরখানা কেমন আছে, কাজের কোন অসুবিধা হয় কিনা, বেশি অসুবিধা হলে জামাল নিজের দোকানেই কাজ করতে বলেছে। এসব খবর নেয়া শেষ হয়ে জামাল নিজের হাতে নিয়েই খাওয়া শেষ করে। আমেনাকে বলে, হুজুরের কাছাকাছি থাক। সব সময় খেয়াল রাখবে হুজুরের কখন কি প্রয়োজন হয়।

সেদিনও রাত দশটায় দোকান বন্ধ করে জামাল ঘরে এল। এসেই সোজা হুজুরের রুমে গেল। হুজুর নেই। বোধ হয় তিনি হাম্মামখানায় আছেন। রান্না ঘরে গেল। আমেনা নেই। তাহলে নিশ্চয়ই বেড রুমে আছে। না নেই। হাম্মামখানা খোলা। কেউ নেই। বেড রুমে কেউ নেই। তাহলে নিশ্চয়ই বাইরে গেছে। কিন্তু হুজুর তো কাজ থেকে ফিরে বাইরে যান না কোন দিন। আমেনাই বা গেল কোথায়! কিছু কেনা কাটা করতে গেল? কেনা কাটার তো কিছুই নেই। সবই তো আছে ঘরে। সে খাবার টেবিলে গেল। সেখানে অন্যদিনের মত কোন খাবার নেই। একটা বাটিতে কিছু নোডলস পড়ে আছে। বাচ্চাদের কামরায় গেল। বড় মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার মা কোথায়?

আমরা তো স্কুল থেকে এসে দেখিনি।

কোথায়ও যাবে বলেছিল তোমাদের?

না, আমরা তো কিছুই জানি না। বোধ কোথায়ও বেড়াতে গেছে এই ভেবে আমি নুডলস তৈরি করে সবাই খেয়েছি। কোন খাবার ছিল না।

কোথায় যেতে পারে! পরিচিত কয়েকটা বাসায় জামাল ফোন করল। না, কোন বাসায়ই যায়নি। তাহলে আর কোথায় যেতে পারে! জামাত ভাইদের কয়েক জনকে ফোন করল। দু এক জনের সাথে আলাপও করল। কেউ কোন পরামর্শ দিতে পারল না। কারন ছোট হুজুরকে সন্দেহ করা মানে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়া। নিশ্চিত না হয়ে কাউকে সন্দেহ করা কবিরা গোনাহ্।

জামালের মনটা অস্থির হয়ে আছে। কি করবে, কার কাছে সাহায্য চাইবে! হঠাৎ কেন জানি তার মনে পড়ল আমেনার পাসপোর্টের কথা, গ্রীন কার্ডের কথা। দেখি তো আছে কিনা! যেখানে পাসপোর্ট আর গ্রীন কার্ড থাকে সে ড্রয়ার খুলল। দেখল সবই আছে, শুধু আমেনারগুলো নেই।

এবার তার সন্দেহ হল। কি হতে পারে! তার মনে পড়ল বড় হুজুরের কথা। একমাত্র তিনিই সঠিক উপদেশ দিতে পারবেন। তিনি হয়ত বলেও দিতে পারবেন ওরা কোথায় আছে। জামাল টেলিফোন নিয়ে বসল।

বাংলাদেশে লাইন পাওয়া অত সোজা নয়। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল। যাও দুএকবার লাইন গেল তো হুজুরের ফোন বিজি। হুজুর তো আর শুধু জামালের ফোনের জন্য বসে নেই। তার কত হাজার হাজার ফোন আসে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত। আগেও যতবার হুজুরকে ফোন করেছে একদিনে পায় নাই। একবার শুধু পেয়েছিল একবার ডায়াল করেই। সেদিন হয়ত হুজুর মাত্র ফোনটা রেখেছিল। সেও ছিল সেখানে গভীর রাত। সারা রাত চেষ্টা করে তার হাত ব্যথা হয়ে গেল। লাইন পাওয়া গেল না।

জামালের একটা ক্ষীন আশা আছে। হয়ত ফিরে আসবে। যেখানেই গিয়ে থাক। তিনটা ছোট ছোট বাচ্চা ফেলে তো আর চলে যেতে পারে না! এ তো সম্ভবও নয়। তাহলে বাচ্চাগুলোর কি হবে? একবারও কি বাচ্চাগুলোর কথা ভাববে না! হুজুর তো পোলাপান মানুষ। তার সাথে

যাবে কেন! না, এ হতেই পারে না! ফিরে আসবে অবশ্যই। জামাল দরজার দিকে নজর রেখে টেলিফোন ডায়াল করতে লাগল।

সকাল আটটা বাজল, নয়টা বাজল, দশটা বাজল। এবার জামাল অস্থির হয়ে পড়ল। কি করবে সে! তাহলে কি আসলেই ফিরবে না! বাচ্চাগুলোর কি হবে! দোকানের কি হবে! রান্না বান্নার কি হবে! ওরা আজ স্কুলে যায়নি। ঘরে কান্নার রোল পড়েছে। ওরা ওদের মাকে চায়। কোথায় গেছে খুজে এনে দাও। তিনটা বাচ্চা তাকে ঘিরে চিৎকার করছে, জিজ্ঞেস করছে কোথায় গেছে? মাকে এনে দাও! জামাল অসহায়। কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারছে না।

পরের দিন লাইন মিলল। বড় হুজুরকে পাওয়া গেল। কান্নাজড়িত কণ্ঠে জামাল হুজুরের কাছে ঘটনা পেশ করল। সব শুনে হুজুর কিছুক্ষন চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার বেচইন অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। সাত বার কুলহু আল্লাহ পড়ে বুকে ফু দাও। বেচইন ভাবটা কেটে যাবে। তারপর হারানো জিনিষ পাওয়ার জন্য একটা দোয়া শিখিয়ে বললেন, এটা দিনে তিন বার পড়ে তিন রাকাত নফল নামাজ আদায় কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।

জামাল জিজ্ঞেস করল, হুজুর বাচ্চাগুলোকে এখন কিভাবে কি করব। কে দেখবে তাদের?

হুজুর একটু ধমকের সুরে বললেন, তোমার ঈমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। বাচ্চাদের নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। তুমি কি জান না যে জান দিয়েছেন যিনি দেখবাল করবেন তিনি। তুমি আমি কেউ না।

জামাল সাহস করে আবার জিজ্ঞেস করল, হুজুর আমেনা এখন কোথায় আছে একটু ঈশারা দিয়ে দিন।

তুমি কি জান না ঘরের চৌকাট নষ্ট হয়ে গেলে বদলাতে হয়? সবই আল্লার ইচ্ছা। তার আদেশ ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়েনা।

-৬২-

মানুষের কমবেশি কিছু খায়েস থাকে। খায়েসের প্রকারভেদ আছে। যেমন প্রথম টাকা, তারপর বাড়ী, গাড়ী, নারী। তারপর প্রতিপত্তি নাম যশ। ব্যক্তিবিশেষে খায়েসের রকমভেদ আছে। তবে প্রবাসীর প্রধান খায়েস হল টাকা, তারপর নাম প্রকাশ করা, নিজের নাম জাহির করা। এই জাহির করা নিয়ে অনেক কাহিনী চালু আছে এই নিউইয়র্কের বাজারে। এসব সংগঠন করার পেছনে প্রধান কারণ অনেকটা খায়েস। রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েও এই খায়েস পুরা হয়। নাম যশের মাঝে কেউ কেউ হজ্বকে প্রাধান্য দেয়। তারা মনে করে এটা একটা কোয়ালিফিকেশন। নামের আগে আল-হাজ কথাটা লাগানো যায়। সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, মানুষ সমীহ করে।

সৈয়দ সাহেবের সবই হয়েছে। টাকা পয়সা, নাম ধাম প্রতিপত্তি সব। শুধু হজ্ব বাকি আছে। তিনি এরাদা করেছেন এ বছর হজে যাবেন। এবং যথাসময়ে রওয়ানা দিলেন হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে। যাবার আগে তার এত বড় ব্যবসার সব দায়ীত্ব দিয়ে গেলেন তার ম্যানেজার গফুরের কাছে। লতার যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে সব ব্যবস্থা করে গেলেন। একজন বাঙালী ড্রাইভার লতার জন্য চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত রেখে গেলেন। যখন যা দরকার ড্রাইভার সরবরাহ করবে। যখন যেখানে যাবার প্রয়োজন ড্রাইভার নিয়ে যাবে। সৈয়দ সাহেব বললেন, তোমার কোন

অসুবিধা হবে না। বেশি দিন তো নয়, মাত্র তিন সপ্তাহ। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এই বলে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

সৈয়দ সাহেব হয়ত জানে না এই তিন সপ্তাহে পৃথিবী বদলে যেতে পারে, কোন কোন দেশের মানচিত্র হারিয়ে যেতে পারে, আবার নতুন করে মানচিত্র তৈরি হতে পারে।

এক সপতাহ পর। সৈয়দ সাহেব যখন হজ্জের মাঠে আল্লাহর কাছে নিজকে সম্পুর্নভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছে ঠিক তখনি নিউইয়র্কে অন্য কিছু ঘটে গেল।

লতা সকালে ছেলেকে নিয়ে স্কুলে রওয়ানা দিচ্ছে। দরজার সামনে যেতেই এক কৃষ্ণকায় মহিলা গুড মর্নিং বলে সামনে দাঁড়াল। পেছনে দশ এগার বছরের একটি ছেলে। মহিলার চেহারা অন্যান্য কালো মহিলাদের চেয়ে একটু আলাদা। নাক ততটা চে া নয়। মুখের চামড়া কিছুটা মোলায়েম। বক্ষের আকার এত বড় যে কাপড় ছিড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ছেলেটা বেশ নাদুসনুদুস। মাথায় একটা কেপ। উল্টো করে লাগানো। কাধে স্কুল ব্যাগ। ছেলেটার চেহারাও বেশ কোমল। কোথায় যেন আফ্রিকান মানুষের চেয়ে একটু আলাদা ছাপ। লতা মহিলার দিকে তাকিয়ে আছে। মহিলা বলল, আমি ক্রিস্টিনা। আই লাইক টু টক টু সাইয়েদ। আমি সৈয়দের সাথে কথা বলতে চাই।

সে বাড়ী নেই।

নেই? এত সকালে কোথায় গেল? অফিসেও তো যায়না কয়েক দিন। এদিকে আমার টাকা নেই। আজ দশ তারিখ। টাকা না দিয়ে সে কোথায় গেল?

কিসের টাকা? তুমি কে?

আমি তার সাবেক স্ত্রী। তুমি বুঝি তার ওয়াইফ?

তুমি তার সাবেক স্ত্রী?

লতার মাথা ঘুরছে, এখনি বোধ হয় ঢলে পড়ে যাবে। কোন রকমে নিজকে সামলে নিল।

ডন্ট ওরি! ভয় পেওনা। এখন আমরা ডিভোর্সড। সে তোমাকে বলেনি আমার কথা?

কিসের টাকা?

আমার এবং আমার ছেলের মাসোহারা। দিস ইজ হিস সন জেমস। এটা ওর ছেলে জেমস। আমরা এ মাসে ঘর ভাড়া দিতে পারিনি। প্রতি মাসে এক তারিখে ভাড়া দিতে হয়।

তুমি দু সপ্তাহ পরে আস। সে এখন দেশের বাইরে আছে। আমি এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারব না।

বাড়ীওয়ালা তো কথা মানবেনা। এখন তুমি তোমার পকেট থেকে আমাকে দিয়ে দাও। সাইয়েদ আসলে তুমি তার কাছ থেকে নিয়ে নিও।

তুমি না বললে ডিভোর্সড? তাহলে আবার টাকা কিসের?

ডিভোর্স হলেও আমার কাজ না থাকলে সে আমাকে মাসোহারা দিবে এটা কোর্টের আদেশ। আর ছেলের ভরণপোষণ দিবে ছেলে আঠার বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। এসব সে জানে। আমার কোন কাজ নেই। ছেলের দেখাশুনা করতে হয়।

এ ব্যাপারে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না। সৈয়দ ফিরে আসলে তাকে বলো। এই বলে লতা তার ছেলে নিয়ে স্কুলের দিকে হাঁটতে লাগল।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। সৈয়দ খুব সাবধানে সব কিছু করে আসছে। কিছুতেই যেন লতা এসব জানতে না পারে। সে প্রতি

ছয়মাস পর পর পূর্বের স্ত্রী এবং পুত্রকে মাসোহারা দিয়ে আসছে। প্রতি মাসে চেক দেয়া তার দ্বারা হয়ে উঠে না। তাই ছয় মাসের খরচ একবারে দিয়ে দেয়। গত ছয়মাসের হিসাবটা যে কবে শেষ হয়েছে তার খেয়াল নেই। হজ্বে যাবার প্রস্তুতি এবং ছওয়াবের মোহ-ব্যস্ততা তাকে এমনই বিমোহিত করে রেখেছে যে, এই সামান্য কাজের কথা একবারও মনে আসেনি। সে সম্পুর্ণ ভুলে গেছে কবে শেষ চেক দিয়েছিল। এখন তার মাথায় ছওয়াবের চিন্তা। চেকের চিন্তা নয়। আর এই ভুলে যাওয়া চেক এখন তাকে লতা নামক এক পুলিশের হাতে চেক করিয়ে দিয়ে গেল। কে কখন পুলিশের ভুমিকায় অবতীর্ন হয় সে নিজেও জানে না।

লতা এখন অপ্রকৃতস্থ। মনে হয় সে নিজে হাটছে না। কেউ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে স্কুলের দিকে। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গেইটে। কোথায় যাবে! কি করবে এখন! এত বড় একটা কান্ড করে বসে আছে কোন দিন ঘুণাক্ষরেও কিছু আভাস পায়নি লতা।!লোকটা এতবড় মিথ্যাবাদি! তার আর একটা সংসার আছে! লতা এখন কি করবে? কার সাথে দুটো কথা বলবে? মনের জ্বালা মিটাবে কি দিয়ে? কারও সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন। কিন্তু কে তাকে পরামর্শ দেবে? কি করবে এখন? এসব ভাবতে ভাবতে কোন্ সময় সে আনিসের বাসার দিকে চলেছে খেয়াল করেনি। রাস্তায় লাল বাতি দেখে থামতেই তার খেয়াল হল। তাই ত! ওদিকে যাচ্ছে কেন সে! ডানদিকে মোড় নিল। সাবওয়ের দিকে। বিন্দু আপার ওখানে যাবে। এক মাত্র বিন্দু আপাই তাকে উপদেশ দিতে পারবে। একটা সান্ত্বনা দিতে পারবে।

ঘন্টাখানেক লাগল বিন্দুর ওখানে পৌঁছতে। বিন্দু তখন রান্নাঘরে হাড়িপাতিল পরিষ্কার করছিল। বেল বাজতেই দরজা খুলে দিল। আরে! তোমার চোখ ভেজা! কি হয়েছে? কোন খারাপ খবর?

লতা কোন কথা বলতে পারলনা। অনেকক্ষণ কেঁদে নিল। তারপর সব বলল। শুনে বিন্দু প্রথমেই বলল, বলছিনা! দাঁড়ির নীচে কোন অপরাধ লুকিয়ে থাকে?

চা শেষ করে দুজনে বসল। সককিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণে। কবে কোথায় কি হয়েছিল, মাঝে মাঝে রং নাম্বার ফোন আসা, মহিলা কন্ঠ, মাঝে মাঝে খুব দেরীতে সৈয়দের ঘরে ফেরা ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়ে বিচার বিশ্লেষন হল অনেকক্ষণ। উপসংহারে বিন্দু বলল, আমি কি পরামর্শ দেব ঠিক বুঝতে পারছি না। আগে বাহারের সাথে কথা বলে নিই। আর তুমি আনিসকে সব বল। সেও তোমাকে ভাল পরামর্শ দিতে পারবে। আজই তার সাথে কথা বল। দেখ কি বলে।

স্কুল ছুটির আগেই লতা পৌঁছে গেল চার্চ এভিনিউতে। আনিস ফিরবে বিকেল চারটায়। স্কুল ছুটি তিনটায়। এখন বাজে দু'টা। এতক্ষন লতা কি করবে? কোথায় যাবে? বাসায় যেতে মন চাইছে না। মনে হয় সে বাসাটা তার নয় - সেই কালিনীর। একদিন এই কালিনীও এই ঘরে ঘুমিয়েছে, এই বিছানায়? কি জানি! এমনি করে সৈয়দের অতীতকে নিয়ে তার কল্পনায় একটা ছবি রচনা করছে। সেখানে লতা দেখছে সৈয়দ আর কালি এক সাথে বাজারে যায়, একই বিছানায় ঘুমায়, তাদের সন্তান জন্ম হয়। তারা স্বামীস্ত্রী হিসেবে খুব সুখে আছে। একটা সংসারে যা প্রয়োজন সব তাদের আছে। সেখানে লতার স্থান কোথায়? মনে হল লতা যেন বাইরের কেউ, সৈয়দের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এতদিন তার সাথে একই ঘরে ছিল এ যেন তার কাছে স্বপ্ন মনে হয়। কোন সম্পর্কই যেন গড়ে উঠেনি। লোকটার জন্য একটু মায়াও সৃষ্টি হয়নি,

ভালবাসা দূরে থাক। মনে হয় তার জীবনটা একবারে ফাঁকা। কেউ নেই, কিছু নেই।

চলতে চলতে এক সময় ট্রেড ফেয়ারের কাছে চলে এল। যে রিনাকে সে উপেক্ষা করে এখন তার ওখানেই গিয়ে উপস্থিত হল। রিনা তখন কাউন্টারে ব্যস্ত। লতার কেনার মত কিছুই নেই। তারপরও সে ভেতরে গেল। এটা ওটা হাতিয়ে ফিরে এল কাউন্টারে। রিনার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন? অনেক দিন দেখা হয়না।

আমার তো টাইমের ঠিক নেই। তাই বোধ হয় দেখা হয় না। আজ আপনি একা যে? সেই হিরো কোথায়? নামটা তো ভুলে গেছি।

ও, আনিস? ওর কোন ঠিক নেই। আপনার কেমন চলছে?

আমি কিন্তু ভাবছিলাম আর কিছু। আপনাদের কথাবার্তা চলাফেরায় মনে হয়েছিল অনেক দিনের পরিচয়। তাছাড়া আমি আরও কয়েক জায়গায় আপনাদের এক সাথে দেখেছি। আপনাদের দুজনকে খুব মানায়। হিরোর সাথে হিরোইন। বলে রিনা হেসে ফেলল।

লতা কি জবাব দেবে বুঝতে পারছেনা। তার মনের অবস্থা যে কি তা যদি রিনা জানত তাহলে মজা করত না। এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে ইচ্ছে হল না লতার। বেরিয়ে আসছে। রিনা জিজ্ঞেস করল, কিছু নিলেন না?

কিছু কিনতে আসিনি। এমনি এসেছিলাম ঘুরতে। স্কুল ছুটি হবে। তারপর বাসায়।

সেখান থেকে বেরিয়ে আবার উদ্দেশ্য বিহীন চলতে লাগল। লতার মাথায় রিনার কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। হিরো আর হিরোইন! খুব মানায়! এসব ভাবতে ভাবতে আবার স্কুলের গেইটে এসে গেল।

স্কুল ছুটির পর বাচ্চাকে নিয়ে সে রওয়ানা দিল আনিসের বাসার দিকে। পথে পরল ম্যাকডোনাল্ড। ম্যাকডোনাল্ডে বসে ছেলেকে খাওয়াল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। আরও বিশ মিনিট চারটা বাজতে। তারপর ধীরে ধীর রওয়ানা দিল।

চারটার বেশ কিছু পরে আনিস এসে দেখে গেইটের ভেতরে দরজায় দাঁড়িয়ে লতা। সাথে শান্ত। আরে, ভাবী? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?

এই তো কিছুক্ষণ।

আসুন ভেতরে আসুন। লতার চোখের তাকিয়ে আনিস থমকে গেল। কি হয়েছে ভাবী? কোন খারাপ খবর?

আমার মনের অবস্থা ভাল না।

মনের আবার কি হল? এই অসময়ে?

মনের আবার সময় অসময় আছে নাকি? খারাপ ঘটনা হলেই মন খারাপ হয়।

এর মধ্যে আবার কি ঘটনা ঘটে গেল?

জীবন মরণের ঘটনা।

জীবন মরণের ঘটনা? আসলে কি আপনি সিরিয়াস? না জোক করছেন?

আমি সিরিয়াস! এখন আমি কি করব বলতে পার?

ঘটনা কি না শুনেই কি করে বলি কি করতে হবে?

লতা সব ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে আনিস বিশ্বাস করতে পারছেনা। বলল, ওই মহিলার কথা সব বিশ্বাস করলেন? মিথ্যাও তো হতে পারে।

না আনিস, মিথ্যা হবেনা। ছেলেটার চেহারার মাঝে আমি সৈয়দের মুখের ছাপ দেখেছি। সে মিথ্যা হতে পারে না। ছেলেটার চেহারা পুরো

আফ্রিকানের মত নয়। কোথায় একটা লাবন্যতার ছাপ আছে যা অন্যান্য কালোদের থেকে আলাদা মনে হয়। এটা ওরই সন্তান।

এদেশে তো এমন অহরহ ঘটে থাকে। তার জন্য মাথা খারাপ করে লাভ কি? এখন নিজের সংসার নিজে সামলাতে হবে। সেই মহিলা যাতে আর কিছুতে নাক গলাতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

বুঝতে পারছনা এখানে নাক গলানোর কিছু নেই। যা হবার তা হয়েই গেছে। এখানে আমার মনের অবস্থার কথা বলছি। আমার মন আর কিছুতেই কোন অবস্থাতেই সৈয়দকে শ্রদ্ধা করতে পারবেনা। যাকে শ্রদ্ধা করা যায়না তাকে ভালবাসা যায় না। বিয়ের সময় সে এ সব গোপন করেছে। বলেছে, কাজ করতে করতেই জীবন চলে গেছে। বিয়ে করার কথা ভাববারও সময় হয়নি। তাছাড়া উপযুক্ত পাত্রীও মিলেনি। এত বড় ঘটনা সে গোপন রেখেছে। সে জালিয়াতি করে বিয়ে করেছে। আমার মনে হচ্ছে ঐ ঘরবাড়ী আমার নয়। আমি সে বাড়ীর কেউ নই। আমি তার দু'নম্বর স্ত্রী। আমি এক বিবাহিত লোকের স্ত্রী। তার আগের স্ত্রী জীবিত আছে, তার সন্তান আছে। সে তাদের সব দায়ীত্ব বহন করছে। তাদের সাথে এখনও নিবিড় সম্পর্ক আছে। সেখানে আমাকে মনে হচ্ছে সৈয়দের একজন কাজের মানুষ। তার দেখাশোনা করার জন্য, তার ঘর, ঘরের কাজকর্ম করার জন্যই যেন আমাকে বিয়ে নামে একটা প্রহসন করেছে।

ভাবী, আপনি এখন এসব চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিন তো। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন। মাথা গরম করলে চলবেনা। ধীরে সুস্থে চিন্তা করুন। সৈয়দ সাহেব ফিরে আসুক। তার সাথে কথা বলুন। আচ্ছা আমি চা করে নিয়ে আসি। খেতে খেতে আলাপ করা যাবে।

কোন আলাপই জমেনা। আনিস চেষ্টা করে কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরাতে, লতা চোখের জল ফেলে আর একই কথা বার বার বলে। মহিলা তো বলল, ওটা সৈয়দের ছেলে! কতদিন সেই মহিলার সাথে এক সাথে ঘর করেছে? কবে ছেলে হল? সেই ছেলে সব সম্পদের অংশিদার হবে? বড় হয়ে সে কাকে পিতা বলে দাবী করবে? লতার মনে হল তার নিজের ছেলের কোন মূল্যই নেই। সৈয়দের দু'ছেলে। তার দু সংসার! এখনও তাদের ভরণপোষণ করছে! কতদিন চলবে? বলতে বলতে লতা এক সময় ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এতক্ষন আনিস কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারেনি। শুধু শুনেই যাচ্ছিল। এতটা গুরুত্বও দেয়নি। যখন দেখল লতার কান্না আর থামছে না, চোখের জল বাধ মানছে না, তখন লতার হাতে দু'টা টিসু পেপার দিল চোখ মুছার জন্য। লতা তার হাত থেকে টিসু পেপার না নিয়ে তার মুখটা লতার মত এলিয়ে দিল আনিসের হাতে এবং মুর্ছা যাবার মত ঢলে পড়ল। আনিস তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। শান্ত মায়ের কাছে এসে জিজ্ঞেস করছে, মা, কাঁদছ কেন? আনিস লতাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিল। জানালাটা খুলে দিল। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, এসব নিয়ে এখন আর কোন চিন্তা করবেন না।

আনিস মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। লতা চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। অনেকক্ষন পর হঠাৎ আনিসের হাতটা ধরে নিয়ে তার মুখে বুলাতে লাগল। আনিসের মনে হল তার নিজের হাতটা আর নিজের নেই।

সন্ধ্যার পর ম্যাকডোনাল্ড থেকে খাবার নিয়ে এল আনিস। শান্ত খুব পছন্দ করে এই খাবার। অনেক অনুনয়ের পর লতা সামান্য মুখে দিল। এক সময় অনিচ্ছাসত্বে ঘরের দিকে রওয়ানা দিল লতা। আনিস সাথে গেল। লতাকে তার বেড রুমে শুইয়ে দিয়ে শান্তকে তার খেলনা রুমে

দিয়ে বসে রইল অনেকক্ষন। এক সময় আনিস বলল, এবার তাহলে আমি যাই। লতা কোন কথা বলেনি। শুধু আনিসের হাতটা ধরে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল।

শান্ত ছেলে শান্ত ঘুমিয়ে গেছে তার রুমে। আনিস বসে আছে লতার বিছানায়। মাথার পাশে। মাথায়, মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। গভীর রাত পর্যন্ত।

সকালে ক্লাশে যাবার আগে আনিস ফোন করল। কেউ উঠায়নি। শেষে নিজেই গেল। গিয়ে দেখে লতা লতার মত পড়ে আছে বিছানায়। শান্ত স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়নি। আনিস জানে শান্ত সকালে কি খায়। একটা ডিম, এক পিস রুটি আর একটু দুধ। আনিস শান্তকে খাইয়ে স্কুলে নিয়ে গেল। তারপর ফিরে এল লতার কাছে। আনিস নাস্তা তৈরি করে লতাকে ডাকল। অনেক ডাকাডাকির পর লতা বলল, আর খেয়ে কি হবে। একটু বিষ খেতে পারলে আমার জন্য ভাল হয়। তুমি আমার জন্য ক্লাশ বাদ দিচ্ছ কেন? ক্লাশে চলে যাও।

আমার ক্লাশটা বড়, না আপনি বড়? আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে আমি ক্লাশে গেলে কোন কাজই হবেনা। কোন কিছুতেই মন দিতে পারব না। এমনিতেই ক্লাশে বসে শুধু আপনার কথা মনে আসে যখন তখন। পড়া থেকে মন চলে যায় বহুদূরে। আর এ অবস্থায় ফেলে গিয়ে ক্লাশে বসতেই পারব না। নিন, একটু খেয়ে নিন! বলে আনিস নিজেই এক টুকরো রুটি ডিমের সাথে নিয়ে লতার মুখে তুলে দিল। লতা বিনা বাক্যে খেতে লাগল। একসময় লতা বলল, এবার তুমি খাও। তুমিও তো এখনও কিছু খাওনি।

ক্রমশঃ...